প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

খাতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

নবম বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০১৯

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2019; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

আন্তর্জাতিক

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও 'সুরক্ষার দায়িত্ব' তত্ত্ব (আরটুপি) ৯
মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন খান ও সায়মা আহমেদ

ইতিহাস

আসাম-বাংলা সম্পর্ক এবং জাতিবিদ্বেষের ঐতিহাসিক পটভূমির খোঁজে ৪৭
আলতাফ পারভেজ

ভূ-রাজনীতি

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের ভূকৌশলগত গুরুত্ব : আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে সমুদ্র, জ্বালানি ও পরিবহন সংযোগ ৭৭
শ্রুতি এস পাটানায়েক

রাজনীতি

কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ : স্বরূপ অন্বেষণ ৯৭
আলেকজান্ডার লিবম্যান ও আনাসতেসিয়া ভি. অবিডেঙ্কোভা

রাজনৈতিক অর্থনীতি

বিপন্ন পৃথিবীতে আন্দোলনের রাজনৈতিক অর্থনীতি ১১৭
খলিলউল্লাহ্

বইআলোচনা

জাতীয়তাবাদ শেষ কথা হতে পারে না ১৪৭
প্রতীক বর্ধন

লেখক পরিচিতি ১৫৮



*প্রতিচিন্তা*র এই সংখ্যায় আমরা বেশ কিছু বিষয়ের ওপর নজর দিয়েছি। কিন্তু বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত। এই অঞ্চলের জাতিগত ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর নজর দিয়েই দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই লক্ষ্যে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে আঞ্চলিক পরিসরের গণ্ডি ছাড়িয়ে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখার ব্যাপারে নজর দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের মতো জাতিগত বিষয়ের বাইরেও আসামের জাতীয় নাগরিক তালিকার প্রেক্ষাপটে আসাম-বাংলা সম্পর্কের ঐতিহাসিক শিকড় খোঁজা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আর সেখানে যুক্ত হয়েছে ভূ-রাজনীতি ও অভিবাসনের মতো বিষয়গুলো। এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিটি দেশের শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ভিন্ন মাত্রা চোখে পড়েছে। আর সেখানেই দেখা হয়েছে কর্তৃত্ববাদী দেশগুলোর সম্মিলনে গঠিত বিভিন্ন সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম। এর বাইরে অন্য যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেখানে পরিবেশ বিপর্যয় এক বড় প্রপঞ্চ। আর তাই সমাজ ও পৃথিবী বাঁচানোর এই যাত্রায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভবিষ্যতের ওপরও নজর দেওয়া হয়েছে এই সংখ্যায়।

রোহিঙ্গা সংকট এই অঞ্চলের বহুদিনের এক বিষফোড়া হয়ে আছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের মধ্যে বিস্তর ক্ষত এই সংকট। নতুন করে আবারও ২০১৭ সালে মিয়ানমার সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণের প্রতিফলন ঘটে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালিয়ে বিতাড়িত করা হয় লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে। তারা আবার আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু সংকটের সমাধানে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চীন, রাশিয়া ও ভারতের আর্থরাজনৈতিক স্বার্থ। আবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও সংকটের সমাধানে আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় কূটনীতির ওপরই মূল ভরসা রেখেছে। এর বাইরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সাহায্য ও সংকট সমাধানের আহ্বান করা ছাড়া কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ চোখে পড়ছে না।

পুরো সংকটে জাতিসংঘের ভূমিকা থেকে গেছে দ্ব্যর্থবোধক। সাধারণত এ ধরনের মানবিক সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কথা বললেই মাথায় আসে নিরাপত্তা পরিষদের কথা। পাঁচ স্থায়ী সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদে কোনো বিষয়ে একজন সদস্য ভেটো দিলেই জাতিসংঘ আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়ার যেহেতু মিয়ানমারে শক্ত আর্থরাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তাই সবাই ধরেই নেয় তারা ভেটো দেবে। তাই জাতিসংঘের ওপর ভরসা করার কিছু নেই। কিন্তু মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন খান ও সায়মা আহমেদ দেখিয়েছেন যে নিরাপত্তা পরিষদের বাইরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ রোহিঙ্গা ইস্যুর মতো সংকটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট ডকট্রিন বা সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব হতে পারে কার্যকর ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সংকটের সমাধান না হলেও সংকট সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগে সবচেয়ে সক্ষম চীন, রাশিয়া ও ভারতের মতো দেশগুলোর ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা সহজ হবে। পুরো বিষয়টি জাতিসংঘ সনদের আলোকে এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন পূর্ববর্তী ঘটনার উদাহরণ টেনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তানজিমউদ্দিন খান ও সায়মা আহমেদের লেখায়।

রোহিঙ্গা ইস্যুর পাশাপাশি নতুন করে শুরু হয়েছে ভারতের আসামে জাতীয় নাগরিক তালিকা নিয়ে হইচই। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার বলি হতে চলেছে লাখ লাখ বাঙালি জনগোষ্ঠী। শোনা যাচ্ছে, আসামের বাইরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও বিজেপি এই জাতীয় নাগরিক তালিকা তৈরি করবে। উদ্দেশ্য হলো বহিরাগত খুঁজে বের করে ভারত থেকে বিতাড়িত করা এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মের লোকদের নাগরিকত্ব প্রদান করা। আর এই লক্ষ্যে ভারতের নাগরিকত্ব বিলের সংশোধনের কথাও জোরেশোরে বলছেন বিজেপির নেতারা। তবে আসামে ইতিমধ্যে ১৯ লাখ বাঙালিকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় নাগরিক তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সংকটের সূত্র খুঁজতে গিয়ে আসাম-বাংলার ঐতিহাসিক সম্পর্ক খতিয়ে দেখতে আমরা আগ্রহী হয়েছি। আলতাফ পারভেজ তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন অসমিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে বিদ্বেষের ঐতিহাসিক পটভূমি।

তবে এসব সংকটের বাইরেও এই অঞ্চলের রয়েছে বিস্তর সম্ভাবনা। বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের দেশগুলোর রয়েছে একক ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। সমুদ্র অর্থনীতি, জ্বালানি ও পরিবহন সংযোগের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও এই দুই সাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব উঠে এসেছে শ্রুতি এস পাটানায়েকের লেখায়। জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার বাইরে গিয়ে এই অঞ্চলকে এক সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। এই লেখার আরেকটি বিষয় পাঠকের জন্য সহায়ক হবে। রোহিঙ্গা বিষয়ে যে লেখাটি ছাপা হলো, তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এই লেখা। চীন ও ভারত যেসব ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে, তারও বিস্তৃত আলোচনা এখানে রয়েছে। সচেতন পাঠক সহজেই ঘটনাগুলোর আন্তসম্পর্ক বুঝতে পারবেন।

তবে এসব সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো গণতন্ত্রের সংকট। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর সমস্যা হলো জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে তারা নিজেদের ক্ষমতা আঁকড়ে

থাকার স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয়। আর তা করতে যে মাত্রার সহযোগিতা প্রয়োজন, শুধু ততটুকুই বজায় রাখে। বর্তমান বিশ্বে কর্তৃত্ববাদ বিস্তারে এক নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে। এত দিন ভাবা হতো, আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সাধারণত গণতন্ত্রেরই বিস্তার ঘটে থাকে। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সংস্থা এই দায়িত্ব পালন করে আসছে। কিন্তু এর বাইরে নতুন একধরনের প্রবণতাও বিদ্যমান। কর্তৃত্ববাদী শাসকেরাও বিভিন্ন সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদের বিস্তার ঘটান। এই উল্টো ধারার বিষয়টি গণতন্ত্রবিষয়ক লেখাজোখায় উপেক্ষিত থেকে যায়। তাই আলেকজান্ডার লিবম্যান ও আনাসতেসিয়া ভি. অবিডেঙ্কোভার 'কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ: স্বরূপ অন্বেষণ' শিরোনামের লেখাটি ছাপানো হলো।

এসবের বাইরে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমৃদ্ধির পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে আছে পরিবেশের বিপর্যয়। বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে মূলত দায়ী বিশ্বের প্রভাবশালী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। কিন্তু এসব বহুজাতিক কোম্পানি রাষ্ট্রীয় আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের সম্পদ ও টাকার কাছে রাষ্ট্রগুলোও হয়ে পড়ে অসহায়। আবার অনেক শাসক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এসব কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে তাদের পক্ষেই কাজ করেন। ফলে পৃথিবী রক্ষার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে এসব কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে আনতে রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য করার জন্য জনগণই একমাত্র ভরসা। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ আন্দোলনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু পরিবেশ আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় হিসেবে দেখলে চলবে না। তাই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষকেরা কাজ করে চলেছেন। অনেক আন্দোলন বিশ্বব্যাপী চলমানও রয়েছে। এসব আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই এসব আন্দোলনের পেছনে রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর অর্থ। তবে পরিবেশ বিপর্যয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের সংযোজন খুব একটা চোখে পড়ে না। *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় এই বিষয়ের পাশাপাশি আন্দোলনের রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপরও নজর দিয়েছেন খলিলউল্লাহ্।

এবারের বই আলোচনায় অনিল এস অমৃতের একটি বই বাছাই করা হয়েছে। বইটির শিরোনাম হলো *ক্রসিং দ্য বে অব বেঙ্গল: দ্য ফিউরিস অব নেচার অ্যান্ড দ্য ফরচুনস অব মাইগ্র্যান্টস*। বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে মানুষে মানুষে যোগাযোগের কাহিনি চিত্রিত করেছেন অমৃত। সেই সময়েই বঙ্গোপসাগর আজকের বিশ্বায়নের চেয়েও অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিল। আর সেই বিশ্বায়ন ছিল বর্তমান বিশ্বায়নের চেয়েও অনেকাংশে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে সহযোগিতা বিস্তারের ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব বিষয়ে লেখা ছাপার পাশাপাশি এই সাগরের ঐতিহাসিক চেতনাও আলোচনায় তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে ছাপা হলো এই বইয়ের আলোচনা। বিশ্বব্যাপী জেঁকে বসা জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া দক্ষিণ এশিয়াতেও এসে পড়েছে। এর বিপরীতে সম্ভাবনার আশা জাগাতে পারে বঙ্গোপসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা। বইটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিষয়ের ওপরই জোর দিয়েছেন প্রতীক বর্ধন।

আন্তর্জাতিক

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও 'সুরক্ষার দায়িত্ব' তত্ত্ব (আরটুপি)

মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন খান ও সায়মা আহমেদ

সারসংক্ষেপ

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে জাতিসংঘ অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে। এ অচলাবস্থার কারণগুলো খতিয়ে দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের যুক্তি হলো, জাতিসংঘের সহজাত কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। এর ফলে মানবিক সংকটের সময়ে কার্যকর ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সংগঠন দোলাচলের মধ্যে থাকে। জাতিসংঘ গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই এসব দুর্বলতা রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই দুর্বলতার অন্যতম কারণ হলো, যেকোনো মানবিক সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের সিদ্ধান্তের ওপর সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘের পরম নির্ভরতা। উপসংহারে এই দুর্বলতা দূর করতে ভিন্ন দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব বা রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট ডকট্রিনের আলোকে রোহিঙ্গা সংকটের মতো পরিস্থিতিতে এসব দুর্বলতা দূর করার বিকল্প খোঁজা হয়েছে। আর সেখানেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সম্ভাবনা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

মিয়ানমার, সুরক্ষার দায়িত্ব, শরণার্থী, রোহিঙ্গা, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

ভূমিকা

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তৃতীয়বারের মতো[১] মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখের বেশি (Khan and Ahmed,

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

2018)। এর ফলে এই জনগোষ্ঠী কী নামে চিহ্নিত হবে, তা নিয়ে পুরোনো সেই শব্দগত ও আইনি বিতর্ক আবারও শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে এই সংকট ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। এই প্রতিটি শব্দেরই নিগূঢ় আইনি অর্থ রয়েছে। কেউ বলছে 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতকরণ' (Inter-Parliamentary Union, 2017), কেউ-বা বলছে 'নৃশংস হামলা' বা 'গণহত্যা', আবার কেউ বলছে 'জাতিগত নির্মূলের পাঠ্যবই উদাহরণ' (Associated Press and Agence France-Presse, 2017)।

নিঃসন্দেহে মিয়ানমারের 'ছদ্ম-গণতান্ত্রিক' সরকার রোহিঙ্গাদের জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক সত্তা ও ধর্মের কারণে তাদের ওপর অপরিমেয় নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা শুরু করেছে। মিয়ানমারের ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের কারণে রোহিঙ্গারা আর সে দেশের নাগরিক নয়। বাংলাদেশের টেকনাফ উপজেলার পাশেই মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত এই সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা একই সঙ্গে মুসলিম ও বাংলাভাষী হওয়ায় আজ নিজ দেশে পরবাসী। তবে রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষেরা রাখাইন প্রদেশে বসবাস শুরু করে সেই সপ্তম শতকের দিকে। তখন এই অঞ্চলকে বলা হতো আরাকান রাজ্য। সে সময় আজকের বার্মা বা মিয়ানমার নামে কোনো 'জাতিরাষ্ট্র' ছিল না (Encyclopedia Britannica, n.d.)।

সহিংসতার শুরু থেকেই ধর্ষণ, অত্যাচার, হত্যা ও জোর করে বিতাড়ন বিষয়ে ভুক্তভোগীদের ভাষ্য গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নজর কেড়েছে। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া সংকটের প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘের মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলো তাদের সেবা দেওয়া শুরু করে। কিন্তু মিয়ানমার সরকার রাখাইন প্রদেশে এসব সংস্থার প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয় (Khan and Ahmed, 2018)। এর ফলে নৃশংসতার শিকার ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের খাদ্য, ওষুধ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় জাতিসংঘ (Khan and Ahmed, 2018)। জাতিসংঘের সত্য উদ্‌ঘাটন মিশন[২] (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক আইনের চোখে গুরুতর অপরাধের' 'চূড়ান্ত প্রমাণ' পাওয়ার ঘটনা নিশ্চিত করেছে (Peterson, 2018)। জাতিসংঘের এই মিশন জানায় যে মিয়ানমার সেনাবাহিনী 'নির্বিচার হত্যা, নারীদের গণধর্ষণ, শিশুদের নির্যাতন এবং পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ায় জড়িত ছিল' (Peterson, 2018)।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এসব অপরাধের ঘটনায় এই সংকট সমাধানে জাতিসংঘের ক্ষমতাসর্বস্ব নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের ন্যায্য ভিত্তি তৈরি হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক আইনি কাঠামো ও জাতিসংঘের রেজল্যুশন বা প্রস্তাব থাকার পরও নিরাপত্তা পরিষদ এই সমস্যা সমাধানে দ্বিধাগ্রস্ত। এ ছাড়া

সংকট যখন শুরু হলো, তখনো সংকট বন্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো ও মহাসচিবের মধ্যস্থতার ভূমিকা কাজে লাগানো হয়নি। যেমন মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত প্রথম সংকট দেখতে আসেন ২০১৮ সালের জুন মাসে; অর্থাৎ সংকট শুরু হওয়ার এক বছর পর (United Nations Secretary General, 2018)।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘের এ অবস্থা বিবেচনায় বলা যায় যে জাতিসংঘ সনদে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতা এবং নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়ার আর্থরাজনৈতিক স্বার্থের কারণে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আমরা ব্যাখ্যা করেছি কেন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় নিরাপত্তা পরিষদে এই অসাড়তা বিদ্যমান। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে সবচেয়ে যোগ্য অঙ্গসংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কারণ সাধারণ পরিষদের যেই আইনি সক্ষমতা রয়েছে, এর মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করা সম্ভব। একই যুক্তিতে, রোহিঙ্গা সংকটের মতো বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ পরিষদের সম্প্রতি গৃহীত সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বের ওপর আমরা জোর দিয়েছি। সুরক্ষার দায়িত্ব (রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট) তত্ত্বে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে সার্বভৌমত্বকে দেখা হয় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা থেকে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে রক্ষার বৈশ্বিক দায়িত্বের আলোকে (Park and MacDiarmid, 2016 : 39)।

এই প্রবন্ধ দুটি বড় ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের রক্ষায় এবং শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং অচলাবস্থার কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আন্তর্জাতিক মানবিক ও মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের দায়ে মিয়ানমার সরকারকে দায়ী করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বের আইনি সম্ভাবনা এবং বাধাগুলোও তুলে আনা হয়েছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, বিদ্যমান অচলাবস্থা এবং তার কারণ

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের ভেতরে যেই প্রাতিষ্ঠানিক অচলাবস্থা, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রথমেই এর কারণগুলো বিশ্লেষণ করা জরুরি। এই প্রবন্ধে মোটাদাগে পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে চারটি কারণই জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ। অর্থাৎ জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেই এই কারণগুলোর শিকড় রয়েছে। আর শেষ কারণটি বাহ্যিক। কারণ এটা

জাতিসংঘের দুই স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়ার আর্থরাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই জাতিসংঘের অচলাবস্থার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্য নিয়ে প্রতিযোগিতার ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। দেখা হয়েছে কীভাবে বিজয়ী শক্তিগুলো জাতিসংঘের গঠনপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে এবং কীভাবে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্য অর্জনে এই স্থায়ী সদস্যদেশগুলোর দ্বন্দ্ব জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলেছে।

নিরাপত্তা পরিষদের উৎপত্তি ও ক্ষমতাকেন্দ্রিকতাবাদ

জাতিসংঘের অভ্যন্তরে রিয়েল পলিটিকস বা স্বার্থবাদী রাজনীতির প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকেন্দ্রিকতাবাদ ও আধিপত্য বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে বিজয়ী দেশগুলো এই সংগঠন গঠনে আগ্রহী হয়েছিল। বিশেষ করে যখন মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন ও মানবিক সংকটের সময়ে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজনীয়, সে সময়ে এই দেশগুলোর স্বার্থবাদী রাজনীতি বুঝতে হলে এই প্রেক্ষাপট বোঝা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী রাষ্ট্রগুলো ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদের সঙ্গে চীন মিলে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে ১৯৪২ সালে। ১৯৪১ সালের আটলান্টিক সনদের আলোকেই এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। আটলান্টিক সনদ ঘোষণার দুই দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। দুটোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি। এই সনদে তাদের নিজেদের মতো করে তারা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর লক্ষ্য ও দৃশ্যকল্প হাজির করেছিল। আর তা করা হয়েছিল এমনভাবে যেখানে তাদের জাতীয় স্বার্থ সবচেয়ে বেশি অর্জিত হবে। যেমন বিজয়ী শক্তিগুলো জাতিসংঘের অন্যতম মূল অঙ্গসংগঠন[৩] নিরাপত্তা পরিষদ সৃষ্টি করেছিল। এটা সৃষ্টির ধরনই ছিল এমন যেন যাবতীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষমতা চীনসহ তাদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে থাকে। স্থায়ী পাঁচ সদস্য (পি-৫ বা বিগ-৫) হিসেবে তারা নিজেদের মর্যাদা নিশ্চিত করেছিল। সেখানে তাদের ভেটো ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ যখন তারা মনে করবে নিজেদের ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা দরকার, শত্রুদেশ কর্তৃক ভূখণ্ডগত আগ্রাসন থামানো বা শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করানো দরকার, তখনই তারা ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। সেটা করতে গিয়ে তারা সব দেশকে জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এনেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শর্তের ওপর সহযোগিতা, বাণিজ্য বাধা কমানো, আগ্রাসী দেশগুলোর নিরস্ত্রীকরণ এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা ও শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্য পূরণ করা।

নিরাপত্তা পরিষদের বড় পাঁচ শক্তির ভেটো ক্ষমতা যুক্ত করার ঘটনায় এখন ভিন্ন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘ সনদে যেই সামষ্টিক শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছিল, বিশ্বব্যাপী তা নিশ্চিত করার প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা এখানে যুক্ত হয়েছে। এই পাঁচ শক্তিশালী দেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা পরিষদে তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে যখন তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন আসে, অথবা তাদের স্বার্থ বা স্বার্থগুলো ঝুঁকির মুখে পড়ার মতো কোনো পরিস্থিতি হাজির হয়। ফলে যখন খুব বেশি প্রয়োজন, তখনো নিরাপত্তা পরিষদ বহুলাংশেই অকার্যকর ও দোলাচলের মধ্যে থাকে (Khan and Ahmed, 2018)। অন্য কথায়, স্থায়ী সদস্যরা যেকোনো গুরুতর পরিস্থিতি বা বিষয় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে থাকে। যদি সেই বিষয় তাদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে মানবিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তারা অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। ফলে মানবিক সংকটের সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদ হয়ে পড়ে অকার্যকর (Khan and Ahmed, 2018)।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে মানবিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে একটি বিষয়ের ওপর। তা হলো অপরাধী রাষ্ট্র বা সত্তা, স্থায়ী পাঁচ সদস্যের এবং নির্দিষ্ট সময়ে বৈশ্বিক ক্ষমতা মেট্রিক্সের মিত্র দেশ কি না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী এই পাঁচ সদস্যরাষ্ট্র গুরুতর উদ্বেগের ঘটনায় ২০৪টি রেজল্যুশনে ভেটো দিয়েছে (Dag Hammarskjold Library, n.d.)। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (১৯৯১ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) চীন ১১ বার ভেটো দিয়ে জাতিসংঘকে বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের পুরো সময়ে দেশটি মাত্র একবার ভেটো দিয়েছিল (Dag Hammarskjold Library, n.d.)।

ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারের প্রবণতা দেখলে বোঝা যায় চীন ও রাশিয়া এ ক্ষেত্রে একে অপরের মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমা শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই এই ক্ষমতা ব্যবহার করছে (Dag Hammarskjold Library, n.d.)। ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন নিরাপত্তা পরিষদে একটি রেজল্যুশন উপস্থাপন করে, যেখানে অং সান সু চির মুক্তি এবং ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসিসহ সব রাজনৈতিক দলের স্বাধীনভাবে কাজ করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু চীন ও রাশিয়া প্রথমবারের মতো এর বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের প্রতি যৌথ সমর্থন জানিয়েছিল (UN News, 2007)। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভেটো ক্ষমতার বেশির ভাগই প্রয়োগ করা হয়েছে সিরিয়া, রুয়ান্ডা, কসোভো ও সুদান প্রভৃতি দেশে জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন

মানবিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে (UN News, 2007)।

২০১৭ সালে যখন রোহিঙ্গা সংকট নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হচ্ছিল, চীন ও রাশিয়া আগের মতোই প্রতিক্রিয়া দেখাল। বিষয়টি এখন স্থায়ী সদস্যদেশগুলোর মধ্যে এক গভীর মেরুকরণ তৈরি করেছে। একদিকে আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন, যারা নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে। অন্যদিকে আছে চীন ও রাশিয়া, যারা কোনো ধরনের ব্যবস্থা না নেওয়ার পক্ষে এবং সংকট সমাধানে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সমর্থন দিচ্ছে না।

রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বৈঠক হয় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেই বৈঠকেই চীন ও রাশিয়া মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নেয়। এমনকি রোহিঙ্গা সংকটকে 'জাতিগত নির্মূল' তো দূরের কথা, তারা সংকট বলতেও নারাজ ছিল। বিষয়টির সমাধানে চীন বেশ ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তারা মিয়ানমার সরকারের বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়ার দাবি জানায় এবং আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান করার পরামর্শ দেয় (*Indian Express*, 2017)। একইভাবে রাশিয়াও পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে তারা মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করাকে সমর্থন করবে না। রাশিয়ার যুক্তি ছিল এর ফলে সেখানে অবস্থার আরও অবনতি হবে। এ ছাড়া রাশিয়ার সুপারিশ ছিল রাজনৈতিকভাবে সংকটের সমাধান করা এবং সব অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা (*Indian Express*, 2017)। চীন ও রাশিয়ার এমন সন্দেহজনক অবস্থানের কারণে নিরাপত্তা পরিষদের অন্য সদস্যরাও শক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন।

এথনোসেন্ট্রিজম, মানবিক সংকট এবং জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া

'হুমকি', 'আগ্রাসন', 'আন্তর্জাতিক শান্তি' ও 'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা'—ধারণাগুলোর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা সব সময় একটা এথনোসেন্ট্রিক[৪] দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে আসছে। মানে হলো নিরাপত্তা পরিষদে যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে দাপ্তরিক বিতর্ক হয়, স্থায়ী সদস্যরা তাদের নিজেদের মতো করে এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। যেমন তারা হুমকি বলতে বুঝে থাকে নিজেদের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, আগ্রাসন মানে নিজেদের ভূখণ্ডের ওপর আগ্রাসন, আর ঝুঁকি বলতে উন্নত বিশ্ব বা উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোর প্রতি ঝুঁকি বুঝে থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে মানবিক হস্তক্ষেপের প্রশ্ন এলেই এই ধারণাগুলোকে বেশির ভাগ সময়েই তারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থের আলোকেই দেখে থাকে। এথনোসেন্ট্রিজমের এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনায়, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে নিরাপত্তা পরিষদে এসব ধারণা ও ডিসকোর্স যেভাবে চর্চা করা হয়, সে ক্ষেত্রে এগুলো সত্যিকার অর্থেই আন্তর্জাতিক

বা বৈশ্বিক কোনো অর্থ বহন করে কি না।

তা ছাড়া স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীতে সশস্ত্র সংঘাতের আন্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র বদলে গেছে। এখন রাষ্ট্রের ভেতরেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত ঘটে থাকে। বর্তমানকালের বেশির ভাগ অভ্যন্তরীণ সংঘাতগুলো অনুন্নত বা দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোর মধ্যেই ঘটছে। সেসব দেশের সরকারগুলো নিজেদের জনগণকে হত্যা করে চলেছে (Gurr, 2007)। সংঘাতের কারণগুলোও বহুমুখী। এগুলোর উৎপত্তি ঘটছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে, যার মূল কারণ হলো নির্দিষ্ট শাসকশ্রেণির বৈধতার প্রশ্ন। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোকে একীভূত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা (Gurr, 2007)। এসব ক্ষেত্রে আন্তসীমান্ত বিদেশি আগ্রাসী শক্তি থাকে না বা ভূখণ্ডগত আক্রমণও ঘটে না। কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায়, তাহলে এসব সংঘাত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য দরকার, সেগুলো পাওয়া যায় না।

'শান্তি ও নিরাপত্তা' ধারণার এমন ত্রুটিপূর্ণ ও সংকীর্ণ ব্যাখ্যার কারণে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রগুলো শান্তি ও নিরাপত্তার ধারণাকে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের আলোকেই দেখে থাকে। যেমন পূর্ব তিমুর ও সিয়েরা লিয়নে জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন মানবিক হস্তক্ষেপের ঘটনাকে সফল উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কেন নিরাপত্তা পরিষদ এই দুটি সংকটে এত দ্রুত হস্তক্ষেপের অনুমোদন দিয়েছিল এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই শান্তি কার্যক্রম চালানোর জন্য এত বিশাল অঙ্কের টাকা ও বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রদান করেছিল।[৫] পরিষ্কার হতে হলে বুঝতে হবে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং রক্তমিশ্রিত হীরার মজুতের বিষয়টি। পূর্ব তিমুরের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আর সিয়েরা লিয়নের হীরার জোগান ছিল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের জন্য বড় প্রণোদনা। জাতিসংঘের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় মানবিক হস্তক্ষেপ দুঃখজনকভাবেই শেষ হয়ে যায়। ফলে যেসব দেশে সম্পদের স্বল্পতা আছে, সেখানে মানবিক সংকটের জরুরি প্রয়োজনেও নিরাপত্তা পরিষদ হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তখন তারা অনুন্নত এসব দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকির ব্যাপারটি বহুলাংশেই এড়িয়ে যায় অথবা বেমালুম ভুলে যায়।

একইভাবে বলা যায়, যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে, তবু তাদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ তারা মূলত কথার বুলিই আওড়াচ্ছে আর উদ্বেগ প্রকাশ করে যাচ্ছে। এর কারণ মিয়ানমারের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক খুবই সীমিত। যেমন ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যিই চারজন সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা এবং দুটি

সেনা ইউনিটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে 'জাতিগত নির্মূলের' অভিযোগ এনে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় (Spetalnick and Brunnstrom, 2018)। এ ছাড়া রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের মানবিক সহায়তা ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে (Reliefweb, 2019)। কিন্তু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কেন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাকে লক্ষ করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে না? কেনই-বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা গণহত্যার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না? এই ধরনের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য বোঝা দরকার যে মিয়ানমারে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ খুবই সীমিত (Spetalnick and Brunnstrom, 2018)। বর্তমানে আমদানি-রপ্তানির জন্য মিয়ানমার যুক্তরাষ্ট্রের ১০৬তম বাণিজ্য অংশীদার (Office of the United States Trade Representatives, n.d.)।

মিয়ানমারে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থ মূলত চীনের প্রতিপত্তি ব্যর্থ করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিদ্যমান স্থিতাবস্থা নির্বিঘ্ন রাখা (Marston, 2015)। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তারাও ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট শুরু হওয়ার পর মিয়ানমারে ৩ লাখ পাউন্ডের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল (BBC News, 2017)। ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১১৪ দশমিক ৯ মিলিয়ন পাউন্ড সমমূল্যের। আর ২০১৬ সালে ৩২ দশমিক ৩ মিলিয়ন পাউন্ড সমমূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল (House of Commons Library, 2018)।

এই পরিস্থিতিতে মিয়ানমার সরকারের হাত থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জন্য তেমন কোনো চিন্তার বিষয় নয়। ফলে রোহিঙ্গাদের প্রতি গণনৃশংসতাকে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি বিবেচনা করছে না। যেমন ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে ৯ বার আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কোনো কার্যকর ফল আসেনি। ২০১৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম বৈঠক হয় (Lederer, 2017)। সেখানে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রোহিঙ্গা সংকটের ধরন দেখে বলেছিলেন যে এই সংকট একই সঙ্গে মানবিক জরুরি অবস্থা এবং 'মানবাধিকার দুঃস্বপ্ন' তৈরি করেছে (*Guardian*, 2017b)। তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করা হয়েছিল যে রাখাইন অঞ্চলে মানবিক সহায়তাকর্মীদের ঢোকা দরকার এবং এমন একটি অবস্থা তৈরি করতে হবে, যেখানে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে (Lederer, 2017)। জাতিসংঘের মহাসচিবের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এই সংকটকে 'জাতিগত নির্মূল' বলে চিহ্নিত করেছিল (Lederer, 2017)। মিয়ানমারে অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত সে দেশে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার দাবিও

এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে (Lederer, 2017)। ৮৮টি সিভিল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও দাবি আসে (Lederer, 2017)।

এত কিছু ঘটার পরও নিরাপত্তা পরিষদ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিশ্রুতির বাইরে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। প্রথম উন্মুক্ত বৈঠক হয়ে যাওয়ার দেড় মাস পর নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি একটি দাপ্তরিক বিবৃতি প্রদান করে। সেখানে মূলত প্রথাগত কূটনৈতিক শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না। যেমন 'নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দা জানায়', 'তীব্র নিন্দা জানায়', 'ব্যাপক সহিংসতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে' এবং 'মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অবমাননা'। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, একই সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ তার বিবৃতিতে মিয়ানমারের 'সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং মিয়ানমারের ঐক্যে'র প্রতি সমর্থন প্রদান করে (United Nations Security Council, 2017a)। এ ছাড়া বলা হয় যে মিয়ানমারের চলমান গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রচেষ্টায় সমর্থন অব্যাহত থাকবে (United Nations Security Council, 2017a)। অতএব, এই বিবৃতির বিষয়বস্তুর আলোকে দেখা যায় নিরাপত্তা পরিষদের পদক্ষেপ অলংকার আর দ্ব্যর্থবোধকতার মধ্যে সীমিত থেকেছে। এগুলো রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের বাস্তব কূটনৈতিক সমাধানবিবর্জিত। বস্তুত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে এবং গণনৃশংসতা ঠেকাতে স্থায়ী পাঁচ সদস্যদেশের গভীর দ্বান্দ্বিক অবস্থান ও অনীহা প্রকাশ পায় এখান থেকে।

শুধু নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যই নয়, কুয়েত ও নেদারল্যান্ডস রাখাইন প্রদেশে একটি ভ্রমণকারী মিশন পাঠাতে মিয়ানমার সরকারকে রাজি করাতে সক্ষম ছিল। সংকটের এক বছর পর ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত একটি মিশন পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল নিরাপত্তা পরিষদ (Reliefweb, 2018)। নিরাপত্তা পরিষদ যেই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল, তা পরিধির দিক থেকে আবারও সেই সীমিতই থেকেছে। সেখানে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য নিরাপদ শর্ত তৈরি করা এবং সংঘাতের আসল কারণ সমাধানের কথা বলা হয়েছিল (Security Council Press Statement, 2018)।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সত্য উদ্‌ঘাটন মিশনের প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় যে মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী যেই অপরাধ করেছে, সেখানে 'গণহত্যার উদ্দেশ্য' ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'রাখাইন প্রদেশে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং যেই পদ্ধতিতে সেগুলো করা হয়েছে, এর ধরন, গুরুত্ব ও পরিধি গণহত্যার উদ্দেশ্য হিসেবে অন্যান্য প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হবে' (UN Human Rights Council, 2018 : 16)। অনেক সুপারিশের মধ্যে সেই মিশন নিম্নোক্ত সুপারিশও রেখেছিল :

নিরাপত্তা পরিষদের উচিত মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ঘটা অপরাধের জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। এটা করতে এই ঘটনা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে পাঠানো উচিত অথবা বিকল্প হিসেবে সাময়িক একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিত। এ ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের উচিত যারা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় গুরুতর অপরাধের দায়ে সবচেয়ে বেশি দায়ী, সেসব নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করাসহ সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। মিয়ানমারের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা উচিত (UN Human Rights Council, 2018 : 19)।

মিয়ানমারকে দায়ী করার ব্যাপারে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে চীন ও রাশিয়া তাদের আগের অবস্থানে অটল থাকে। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করে যেন রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমারে নাক গলানো না হয় এবং চাপ দেওয়া বন্ধ করে। তাদের যুক্তি হলো এটা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মিয়ানমার সরকারের হাতেই থাকা উচিত। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ধৈর্যশীল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে বিষয়টির সমাধান এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ জানিয়ে তারা অনুরোধ করে। মিয়ানমার সরকারের প্রতি তাদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন থেকে বোঝা যায় যে রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের আচরণ বদলের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সব স্থায়ী সদস্য কখনোই ঐকমত্যে পৌঁছাবে না (*Daily Star*, 2018a)।

নিরাপত্তা পরিষদের এমন স্থবিরতার প্রভাব জাতিসংঘের অন্য অঙ্গসংগঠনগুলোর ওপরও পড়ে। নিরাপত্তা পরিষদে উদ্দেশ্যহীন আলোচনা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপের মতো কোনো ফলাফল আসেনি। সেখানে কোনো নিরাপদ অঞ্চল বা জাতিসংঘের ভিত্তি তৈরি হয়নি, যেখান থেকে মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলো সাহায্য বা আশ্রয় দিতে পারে (Khan and Ahmed, 2018)। নিরাপত্তা পরিষদ থেকে অনুমোদনের ঘাটতি থাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের পরিধিও সীমিত হয়ে পড়েছে। সে সময়ে মহাসচিবের কার্যালয় থেকেও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী মহাসচিব চাইলে সংঘাত ঠেকাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরনের ভূমিকা পালনের দীর্ঘ ইতিহাসও রয়েছে মহাসচিবের। কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটে এই ভূমিকা কাজে লাগানো হয়নি।

তবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার চেয়ে গুণগতভাবে কিছুটা ভিন্ন ছিল। সাধারণ পরিষদ ২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর একটি বিশেষ রেজল্যুশন গ্রহণ করে। ইতিবাচক দিক ছিল ১২২টি দেশ

রেজল্যুশনের পক্ষে ভোট দেয়। ১০টি দেশ এর বিপক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট দেওয়া দেশগুলো হলো চীন, রাশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, বেলারুশ, সিরিয়া ও জিম্বাবুয়ে (*Guardian*, 2017a)।

মানবিক এই সংকট সমাধানে রেজল্যুশনটির প্রভাব ছিল খুবই কম। কিন্তু রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত নিরপরাধ ও বেসামরিক রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংস আক্রমণ বন্ধে মিয়ানমার সরকারকে অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া জাতিসংঘের তরফ থেকে মিয়ানমারের জন্য একজন দূত নিয়োগের ব্যাপারে অনুরোধ করা হয় (*Guardian*, 2017a)। এর বাইরে সাধারণ পরিষদ মিয়ানমার সরকারকে আরও কিছু অনুরোধ জানায়। এগুলো হলো সে দেশে সাহায্যকর্মীদের ঢুকতে দেওয়া, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করা (*Guardian*, 2017a)। কিন্তু সাধারণ পরিষদও এই সংকটে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এসব প্রচেষ্টার বাইরেও মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ বেশ কিছু প্রতিবেদন ও বিবৃতি প্রস্তুত করেছিল। যেমন ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের রাজনীতিবিষয়ক উপমহাসচিব জেফরি ফেল্টম্যান এবং সংঘাতে যৌন সহিংসতাবিষয়ক মহাসচিব প্রমিলা পাটেন রোহিঙ্গা সংকটের হালনাগাদ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে বিবৃতি প্রদান করেন (United Nations Security Council, 2017b)। ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর থার্ড কমিটি মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে একটি রেজল্যুশন গ্রহণ করে (UN General Assembly, 2017)। ২০১৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, নিরাপত্তা পরিষদ আবারও মিয়ানমারের পরিস্থিতির হালনাগাদ বিষয়ে একটি আলোচ্যসূচি গ্রহণ করে (United Nations Security Council, 2018)। এসব প্রচেষ্টা শুধু কথার ফুলঝুরি ছাড়া অপরাধীদের ওপর আর কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি।

জাতিসংঘ সনদের দ্ব্যর্থবোধকতা এবং এর প্রভাব

মানবিক সংকটে জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে ওপরে বর্ণিত সমালোচনামূলক মূল্যায়ন থেকে একটি প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কেন জাতিসংঘ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনটির সনদ অনুযায়ী যেমন কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, তা হতে পারছে না? এটা ঠিক যে জাতিসংঘের সনদ এ সংস্থাটির সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এটা আসলে বাস্তববাদী ঘরানা ও উদারবাদী মূল্যবোধের মধ্যকার আপসরফার একটি দাপ্তরিক দলিল। বাস্তববাদীরা রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের আলোকে ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার কথা বলে। তারা আন্তরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ওপরও জোর দেয়। এই

ক্ষমতাকেন্দ্রিক বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সব সময়ই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আচরণের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এসেছে। ফলে জাতিসংঘের ভূমিকা হয়ে পড়েছে স্ববিরোধী। এর বিপরীতে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও অন্য বিশেষায়িত সংস্থাগুলো তৈরি করা হয়েছিল মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতি ও উদার মূল্যবোধ তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে মানবিক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বা সংঘাতপূর্ণ এলাকায় সাহায্য, আশ্রয় ও সহায়তা প্রদান করা। কিছু সংস্থা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। বাস্তববাদী ও উদারবাদী ঘরানার এই বিপরীতমুখী মূল্যবোধের কারণে জাতিসংঘের কাজের মধ্যে তৈরি হয়েছে অসংগতি।

জাতিসংঘের সনদে স্পষ্ট বলা নেই কার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এই সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা হবে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রচেষ্টা যেভাবে সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও রয়েছে দ্ব্যর্থবোধকতা ও অসংগতি। এর কারণ সনদে কখনো বলা হয়েছে ব্যক্তির নিরাপত্তা, কখনো বলা হয়েছে জনগণের নিরাপত্তা, আবার কখনোবা সার্বভৌম ভূখণ্ডের নিরাপত্তা। উদাহরণস্বরূপ, সনদের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'আমরা জাতিসংঘের জনগণ', যা স্পষ্টতই সব ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। কিন্তু ২(১) নম্বর ধারায় আবার উদ্দেশ করা হয়েছে রাষ্ট্রকে। সেখানে সব রাষ্ট্রের সার্বভৌম সমতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর কথা স্পষ্ট করা হয়েছে (United Nations, n.d. : Chapter I)। এর ফলে মানবিক সংকট ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে জাতিসংঘ সমস্যায় পড়ে যায়। কারণ ব্যক্তিকে নৃশংসতা থেকে রক্ষা করবে নাকি সার্বভৌমত্ব নীতি অক্ষুণ্ন রাখবে, তা নিয়ে তৈরি হয় দ্বিধা।

২(৪) ও ২(৭) নম্বর ধারা দেখলে এই স্ববিরোধ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। ২(৪) নম্বর ধারায় নিরাপত্তা বলতে ভূখণ্ডগত নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। ফলে এক সদস্য কর্তৃক অন্য সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হুমকি বা শক্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (United Nations, n.d. : Chapter I)। এই ধারায় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে (United Nations, n.d. : Chapter I)। ২(৭) নম্বর ধারায় জাতিসংঘ কর্তৃক কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে (United Nations, n.d. : Chapter I)। কিন্তু সনদের সপ্তম অধ্যায়ের আওতায় সামরিক হস্তক্ষেপের মতো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে জাতিসংঘের (United Nations, n.d. : Chapter I)।

'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা' শব্দগুলোর ব্যাখ্যা না থাকায় জাতিসংঘের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে জটিল। সার্বভৌম সমতার নীতি থাকায় যখন কোনো রাষ্ট্র গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, এবং/অথবা জাতিগত

নির্মূলের মতো আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটায়, তখন জাতিসংঘের তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে (Glennon, 2015 : 85-87)। এই পরিস্থিতিতে, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনকারীও সার্বভৌম সমসত্তা হিসেবে বিবেচিত হবে কি না এবং তার ক্ষেত্রেও অহস্তক্ষেপের নীতি প্রযোজ্য হবে কি না (Glennon, 2015 : 85-87)।

নিরাপত্তা পরিষদের নিষ্ক্রিয়তার আরেকটি উৎস হলো ৩৯ নম্বর ধারা। সনদের এই ধারা মোতাবেক কোনো ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকি কি না, শান্তি ভঙ্গ কি না, অথবা আগ্রাসন হিসেবে বিবেচিত হবে কি না, তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদকে। ফলে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা বা পুনর্বহাল করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া বা সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নেয় (Glennon, 2015 : 85-87)। এই ধারার বলে স্থায়ী সদস্যদেশগুলো প্রতিটি সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের মতো রাজনৈতিকীকরণ করার সুযোগ পায়। কারণ তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রয়েছে।

আপাতদৃষ্টে ৪২ নম্বর ধারায় 'আগ্রাসনকর্ম' বলতে ভূখণ্ডগত আগ্রাসন বুঝিয়েছে। 'আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা বা পুনর্বহাল করার' ক্ষেত্রে যেসব সংঘাত রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই ঘটে, সম্প্রদায়গত, অথবা অভ্যন্তরীণ, সেগুলোয় বলপ্রয়োগের পদক্ষেপ বাতিল করা হয়েছে (United Nations, n.d. : Chapter VII)। আন্তর্জাতিক সংঘাতে যখন নিরাপত্তা পরিষদ এই নীতি প্রয়োগ করে, তখন দ্ব্যর্থবোধকতা তৈরি হয়। যুদ্ধকালীন ও স্বাভাবিক উভয় সময়েই নারী অধিকার, শিশু অধিকার, শরণার্থী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের রক্ষক ও সমর্থক হিসেবে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুত ভূমিকা রয়েছে। ৪২ নম্বর ধারা জাতিসংঘের সেই প্রতিশ্রুত ভূমিকার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

জাতিসংঘের সব কটি বিশেষায়িত সংস্থার লক্ষ্যবস্তুই মূলত ব্যক্তি, রাষ্ট্র নয়। এই সংস্থাগুলোর লক্ষ্য হলো মানবিক সংকট সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিসাধন বা সংশ্লিষ্ট জনগণকে সাহায্য প্রদান করা। ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যের সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের লক্ষ্যের বিরোধ রয়েছে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদ হস্তক্ষেপের মতো পদক্ষেপ নেবে, যখন ভূখণ্ডগত আগ্রাসনের ঘটনা ঘটে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই যখন নিরাপত্তা পরিষদ হস্তক্ষেপ করার মতো পদক্ষেপ বাতিল করে দেয়, তখন জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা কাজ করার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া অন্যান্য সংস্থা সংকটপূর্ণ এলাকার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় ভূমিকা

রাখতে পারবে না, যদি কোনো মিশন পরিচালনা করা না হয়। তখন তারা শুধু বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

সনদের ৪১ ও ৪২ নম্বর ধারা মোতাবেক যেকোনো সংকটকালে জাতিসংঘ কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ ছাড়া এসব সিদ্ধান্ত তখন স্থায়ী পাঁচ সদস্যরাষ্ট্রের রাজনীতি ও ইচ্ছার আওতাধীন হয়ে পড়ে (United Nations, n.d. : Chapter VII)। ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক পদক্ষেপ ছাড়া যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আর ৪২ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ 'আকাশ, সমুদ্র বা স্থল পথে' সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে যদি অসামরিক পদক্ষেপগুলো ব্যর্থ হয় বা অপর্যাপ্ত মনে হয় (United Nations, n.d. : Chapter VII)।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে জাতিসংঘ তার হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার দিয়ে রেখেছে এর আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে। দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে আবার তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ, এখানে জাতিসংঘের এ রকম এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আঞ্চলিক সংগঠন নেই। অতীতে আবার মানবিক সংকটকালে নিরাপত্তা পরিষদ এই হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল নির্দিষ্ট রাষ্ট্র বা কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত জোটের কাছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালের সম্মিলিত টাস্কফোর্সের কথা, ১৯৯৪ সালে হাইতিতে বহুজাতিক টাস্কফোর্সের কথা, অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরে হস্তক্ষেপের কথা এবং ২০১১ সালে ন্যাটো বাহিনীর নেতৃত্বে লিবিয়ায় হস্তক্ষেপের কথা (Johnstone, 2015 : 233)।

একক রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপের দায়িত্ব অর্পণের তিনটি ঘটনা রয়েছে। ফ্রান্স এমন দায়িত্ব পালন করেছে তিনবার। যেসব দেশে অপারেশন করেছে সেগুলো হলো, ২০০৪ সালে আইভরিকোস্ট, ২০১৩ সালে মালি, আর ২০১৩ সালে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (Johnstone, 2015 : 233)। রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। এ ছাড়া ভারত ও চীনের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা প্রবন্ধের শেষভাগে আলোচনা করা হয়েছে।[৬]

এই পরিস্থিতিতে, সন্দেহ পোষণ করা স্বাভাবিক যে মানবিক সংকট ও অভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়গত সংঘাতে হস্তক্ষেপের অনুমোদন আদায়ের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সঠিক জায়গা কি না। কারণ, জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত সংঘাতগুলোর সঙ্গে এসব সংঘাতের মিল নেই। এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার, মানবিক সংকট এবং নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলো মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বেশি প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া মানবিক দিক বিবেচনায় তারাই হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঠিক এখতিয়ার রাখার যোগ্য।

জাতিসংঘ সনদের বাইরেও বেশ কিছু আইনি কাঠামো, কনভেনশন ও বিধিবদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, যেগুলো গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও জাতিগত নির্মূলের ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে থাকে। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে এসব আইনি ভিত্তি উপেক্ষা করে গেছে। এটা শুধু জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতার বিষয় নয়। এর ফলে এ ধরনের মানবিক ও মানবাধিকার আইন থাকা না-থাকার উপযোগিতার প্রশ্নও তৈরি হয়েছে।

২০১৭ সালে তৈরি হওয়া রোহিঙ্গা সংকট বোঝাতে গিয়ে জাতিসংঘ শুরু থেকেই 'জাতিগত নির্মূল' শব্দটি ব্যবহার করে আসছে (Khan and Ahmed, 2018; Stanton, 2017)। এ অবস্থায় জাতিসংঘের উদ্দেশ্য নিয়ে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে। কারণ, এই শব্দের মধ্যেই কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে দ্ব্যর্থবোধকতা রয়েছে। তা ছাড়া জাতিগত নির্মূল বিষয়ে কোনো আইনি দলিল বা চুক্তিও নেই। বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইনে জাতিগত নির্মূল নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই, যদিও এই শব্দের মাধ্যমে জোর করে বাস্তুচ্যুত করা ও গণহত্যা বোঝানো হয় (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.b)।

রোমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) 'জাতিগত নির্মূল' বিষয়টিকে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না। এমনকি এই আদালতের সংবিধির কোথাও জাতিগত নির্মূল কথাটিই ব্যবহার করা হয়নি (International Criminal Court, 2011)। এই আদালতের এখতিয়ারে চার ধরনের অপরাধ রয়েছে। এগুলো হলো গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং আগ্রাসনের অপরাধ। গণহত্যাবিষয়ক অপরাধ দমন ও বিচার বিষয়ে আন্তর্জাতিক যেই চুক্তি রয়েছে, সেখানেও গণহত্যাকে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু জাতিগত নির্মূলকে একই রকম বিবেচনা করা হয় না (United Nations Human Rights Office of High Commissioner, n.d.)। জাতিগত নির্মূল শব্দটি বসনিয়া সংকটের সময় থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ ব্যবহার করে আসছে (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.b)।

এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে জাতিসংঘ সুচিন্তিতভাবেই 'গণহত্যা' ও 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শব্দগুলো রোহিঙ্গাদের বেলায় এড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ, সামরিক বলপ্রয়োগের পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ এই সংকটের সমাধানে আগ্রহী নয়। তাই জাতিসংঘ হয়তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক

গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি আইন ভঙ্গের সত্যতা অস্বীকার করতে চাচ্ছে। যেমন বসনিয়া সংকটের সময় আমরা একই রকম সত্য প্রত্যাখ্যানের ঘটনা দেখেছি। সেই ঘটনায় ১৯৯২ সাল থেকেই জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বসনিয়া সংকটকে বলা হচ্ছিল 'জাতিগত নির্মূল'। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সেব্রেনিকায় বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ঘটনাকে জাতিগত নির্মূলই বলা হচ্ছিল (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.b)।

রুয়ান্ডা, কসোভো ও দারফুরের বেলায়ও একই ব্যাপার দেখা গেছে। ১৯৯৪ সালে যখন রুয়ান্ডার আট লাখ মানুষ নিহত হলো, শুধু তারপরই গণহত্যা শব্দটি ব্যবহার করা হয় (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.b)। কসভোর মৃত্যুযজ্ঞকেও জাতিগত নির্মূল বলা হচ্ছিল, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ১৯৯৯ সালে 'গণহত্যার কোনো সূচক' পায়নি (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.b)। একইভাবে দারফুরে এখনো গণহত্যা ঘটেই চলেছে। কিন্তু জাতিসংঘ একে গণহত্যা বলার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনেকে সন্দেহের সুরে বলেন যে মিয়ানমার সরকারের কর্মকাণ্ডকে আদতে যুদ্ধাপরাধ বলা যাবে কি না। কারণ কোনো একটি সংঘাত আন্তরাষ্ট্রীয় না হলে এবং দুটি সশস্ত্র বাহিনী যুক্ত না হলে যুদ্ধাপরাধের আইন প্রয়োগ করা যাবে কি না, সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। জেনেভা কনভেনশনের কমন আর্টিকেল ৩ সব পরিস্থিতিতে একই গুরুত্ব বহন করে কি না, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। যেমন অভ্যন্তরীণ সংঘাত, গৃহযুদ্ধ এবং সম্প্রদায়গত দাঙ্গায় এই আর্টিকেল একই গুরুত্ব পাবে কি না, সেটা একটা বিতর্কিত বিষয়। এই যুক্তিগুলোর পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য আমরা বলব যে কমন আর্টিকেল ৩ অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত, গৃহযুদ্ধ এবং যেসব যুদ্ধ আন্তর্জাতিক নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবং এই আর্টিকেলের বিধান মোতাবেক বেসামরিক নাগরিকের প্রতি যেকোনো ধরনের বৈরিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া যেকোনো ধরনের হত্যা, নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ, জিম্মি করা, মর্যাদা ক্ষুণ্ন ইত্যাদি ঘটনাও নিষিদ্ধ (International Committee of the Red Cross, n.d.)। এই বৈশিষ্ট্যগুলো রোহিঙ্গা সংকটেও দেখা যাচ্ছে। যেহেতু আর্টিকেল ৩ অনুযায়ী মিয়ানমার সহিংসতা ঘটিয়ে চলেছে, তাই এ কথা বলা যায় যে মিয়ানমার যুদ্ধাপরাধ করছে। তা ছাড়া সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিটিওয়াই) এ বিষয়ে একটি নজির স্থাপন করেই রেখেছেন। সেখানে দেখা গেছে গৃহযুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের বিচার করা যায়। একটি ক্লাসিক উদাহরণ হলো দাসকো তাদিক

(Dasco Tadic) ঘটনা।[৭]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চালানো নির্যাতন ও নৃশংসতার যেসব প্রমাণ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসেছে, তা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে মিয়ানমার সরকার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে। কিন্তু জাতিসংঘ আবারও এই গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ে চুপটি মেরে আছে। প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতও এসব অপরাধকে গুরুতর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.a), যেমন রুয়ান্ডা ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। রোম সংবিধিও বেশ কিছু অপরাধকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই সংবিধির ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে সেসব অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেগুলো পদ্ধতিগতভাবে কোনো একটি বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং 'আক্রমণের বিষয়ে অবগত হয়ে' করা হয় (International Criminal Court, 2011 : 3)। নিচে সেসব কর্মের তালিকা দেওয়া হলো :

হত্যা, বিনাশ, দাসত্ববন্ধন, নির্বাসন বা জোর করে স্থানচ্যুতকরণ, বন্দিত্বকরণ বা আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে অন্য কোনো ধরনের শারীরিক স্বাধীনতার প্রচণ্ড বঞ্চনা, অত্যাচার, ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, জোর করে পতিতাবৃত্তি, জোর করে গর্ভধারণ, জোর করে বন্ধ্যাত্বকরণ এবং একই মাত্রার অন্য কোনো ধরনের যৌন সহিংসতা, রাজনৈতিক, জাতিগত, জাতীয়, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন...জোর করে গুম, বর্ণবাদ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একই ধরনের অন্যান্য অমানবিক আচরণ, অথবা দেহ বা মন অথবা শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুতর আঘাত (UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.a)।

এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে মিয়ানমার সরকার এমন বহু কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। জাতিসংঘের গণহত্যাবিষয়ক বিশেষ দূত অ্যাডামা দিয়েং একবার বলেছিলেন যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রমাণ জোগাড় করার পরিকল্পনা রয়েছে জাতিসংঘের। তখন অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার সম্ভাবনা তৈরি হবে (*Daily Star*, 2018b; Khan and Ahmed, 2018)।

সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইনজ্ঞ ফাতৌ বেনসুদা ইতিমধ্যে এই আদালতকে আইন জারি করতে বলেছেন। তাঁর কথা ছিল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও বাংলাদেশে তাদের জোর করে স্থানান্তর বিষয়ে মিয়ানমারের বিচার করার এখতিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের

আছে কি না, সে বিষয়ে আইন জারি করা (*Guardian*, 2018)।

কিন্তু এটাও কোনো সহজে করার মতো ক্ষমতাবিযুক্ত প্রক্রিয়া নয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের রাজনীতির বাইরে নয়। দারফুর সংকটের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থান এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনা। সুদান যেহেতু রোম সংবিধির সদস্য ছিল না, তাই গণহত্যার তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রয়োজন ছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া। নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৫ সালে অনুমোদন দিয়েছিল বটে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ভোটদানে বিরত থাকে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইনজ্ঞ ২০০৭ ও ২০০৮ সালে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে (Ocampo, 2008)। সুদান সেসব গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নাকচ করে দেয় এই বলে যে তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য নয়। তাই সুদানের ওপর এই আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই (World Without Genocide, n.d.)।

অন্যদিকে ফাতৌ বেনসুদার মতে, যদিও মিয়ানমার এই আদালতের চুক্তিতে সই করেনি, তবু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার এবং তাদের জোর করে বাস্তুচ্যুত করার দায়ে মিয়ানমারের বিচার করা যাবে। তাঁর যুক্তি ছিল নির্যাতিত রোহিঙ্গারা যেহেতু বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাই বাংলাদেশ এই সংঘাতের অংশ। আর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য (World Without Genocide, n.d.)। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইনজ্ঞ মিয়ানমারের ওপর এই আদালতের এখতিয়ার প্রসঙ্গে যেই অনুরোধ করেছে, সে বিষয়ে মিয়ানমার সরকার এর মধ্যেই একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উদ্বেগ জানিয়েছে। তারা বলেছে যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সনদ অনুযায়ী সদস্যরাষ্ট্রের বাইরে অন্য কারও ওপর এই আদালতের এখতিয়ার নেই এবং ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ে স্বাক্ষরিত ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী কোনো দেশ যদি কোনো চুক্তি অনুসমর্থন না করে, তাহলে তার ওপর কোনো চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না (মিয়ানমার সরকারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ২০১৮)।

সদস্যপদ না থাকার যুক্তিতে মিয়ানমার যা-ই বলুক না কেন, তবু অপরাধের জন্য তাদের বিচার করা যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে রোম সনদের ৮৮(৫)(খ) ধারা মোতাবেক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সোপর্দ করতে হবে (International Criminal Court, 2011 : 10)। তবে এটাও স্পষ্ট যে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদনের পথে প্রধান বাধা হলো চীন ও

রাশিয়ার আর্থরাজনৈতিক স্বার্থ (Khan and Ahmed, 2018)। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, রোম সনদের ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ চাইলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক যেকোনো তদন্ত বা বিচার ১২ মাসের জন্য স্থগিত রাখতে পারে, যদি সদস্যরা সবাই একমত হয়। আবার এই স্থগিতাদেশ যতবার খুশি ততবার নতুন করে আরোপ করা যাবে (International Criminal Court, 2011 : 42)। এসব কাঠামোগত ও আইনি জটিলতার কারণে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘটা গুরুতর অপরাধের বিচার করা খুবই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজের দেশে মানবাধিকারের করুণ অবস্থা হওয়ায় একই রকম অভিযোগের ভিত্তিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ চীন চায় না। ফলে জাতিসংঘের পুরো ব্যবস্থাই সংস্থাটির শক্তিশালী সদস্যরাষ্ট্রগুলোর স্বার্থবাদী রাজনীতির কারণে হুমকির মুখে পড়ে গেছে। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির বক্তব্য এবং সাধারণ পরিষদের রেজল্যুশন কেন অকার্যকর এবং শুধুই আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এটা তার একটি কারণ। জাতিসংঘের মহাসচিবের কার্যালয় এবং মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ে শুধুই ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে। অপরাধীদের থামাতে তারা কিছুই করছে না।

শক্তিশালী দেশগুলোর আর্থরাজনৈতিক স্বার্থ : বাহ্যিক কারণ

আর্থরাজনৈতিক স্বার্থের আলোকে নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্যদেশ চীন ও রাশিয়ার জন্য মিয়ানমার বর্তমানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী ভারতের জন্যও। মিয়ানমার ও চীন একে অপরের সঙ্গে সীমান্ত, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি দ্বারা সংযুক্ত। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের ২ হাজার ২২৭ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। মিয়ানমারের শান প্রদেশের পূর্বাঞ্চল আর চীনের ইউনান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে এই সীমান্ত (Kudo, 2008 : 87)। তারা একে অন্যকে বার্মিজ ভাষায় বলে 'পৌকফো', অর্থাৎ ভাই (Kudo, 2008 : 87)।

মিয়ানমারে ভোগ্যপণ্য ও পুঁজির সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক এখন চীন। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মিয়ানমারের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৩০ শতাংশ (Ganesan, 2018 : 12)। এ ছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, রাষ্ট্রমালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজ এবং জ্বালানি খাতেও চীন সাহায্য প্রদান করে থাকে (Ganesan, 2018 : 12)। মিয়ানমারের মোট বৈদেশিক ঋণের ৪৪ শতাংশই চীনের কাছ থেকে নেওয়া (Ganesan, 2018 : 12)।

ভূকৌশলগতভাবেও মিয়ানমার চীনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চীন ভারত মহাসাগরের প্রবেশপথ হিসেবে মিয়ানমারকে দেখে থাকে (Ganesan, 2018 :

7)। বেশ কয়েকটি কারণে এটা চীনের জন্য সুবিধাজনক। চীন মিয়ানমারের দীর্ঘ উপকূলকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই তার দ্বিতীয় করিডর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং ভারতের ওপর নজর রাখতে পারবে (Ganesan, 2018 : 7)। কারণ দক্ষিণ চীন সাগরে জাপান, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো আঞ্চলিক ও বাইরের শক্তিগুলো আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত (Ganesan, 2018 : 7)। এ ছাড়া চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের জন্য মিয়ানমারের কাছ থেকে দেশটি স্থল ও সমুদ্রপথে ইউরোপ ও সেন্ট্রাল এশিয়া অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। যদি এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে হাইওয়ে, পাইপলাইন, রেলপথ, বিদ্যুৎ গ্রিড, বন্দর ও রসদ সরবরাহ উন্নত করার মাধ্যমে চীন ৬০টির বেশি দেশের সঙ্গে যুক্ত হবে (*Global New Light of Myanmar*, 2018)। সম্প্রতি কলকাতা, ঢাকা, মান্দালয় ও কুনমিংয়ের মধ্যে মিয়ানমারের মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়ানোর ব্যাপারে চীন আশা প্রকাশ করেছে।

জ্বালানি নিরাপত্তার ব্যাপারেও মিয়ানমারে চীনের বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। চীন এর মধ্যেই মিয়ানমারের কিয়কপিয়ু থেকে তার দেশের কুনমিং পর্যন্ত ৭৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ তেলের পাইপলাইন নির্মাণ করেছে (*South China Morning Post*, 2017)। মধ্যপ্রাচ্য ও সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আমদানি করা তেল কিয়কপিয়ুতে মজুত করা হয় এবং এই পাইপলাইনের মাধ্যমে কুনমিংয়ে নেওয়া হয়। এর বাইরেও মিয়ানমারজুড়ে চীন ২ হাজার ৫২ কিলোমিটার লম্বা গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করেছে। এর মাধ্যমে রাখাইন প্রদেশ থেকে চীনের ইউনান ও গুয়াংজি প্রদেশে গ্যাস পাঠানো হয় (Min, 2013)। তা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সালবিন ও ইরাবতী নদীতে ছয়টি ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। এখান থেকে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা চীনে রপ্তানি করা হবে (Ganesan, 2018 : 15)।

মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরিতে রাশিয়াও পিছিয়ে নেই। একটি কারণ পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগ বিস্তৃত করা। সম্প্রতি, বিশেষ করে ২০০৫ সালের পর পূর্ব এশিয়ায় চীন ও ভিয়েতনামের বাইরেও রাশিয়া তার সম্পর্ক সম্প্রসারিত করেছে। ২০০৫ থেকে ২০১৪ সময়কালে এই অঞ্চলে রাশিয়ার বাণিজ্য পাঁচ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (Gorenburg and Schwartz, 2019)। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গেও সে তার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য অংশীদারত্ব বাড়িয়েছে (Gorenburg and Schwartz, 2019)।

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সামরিক সহযোগিতা আরও বাড়াতে মিয়ানমার ভ্রমণে এসেছিলেন। মিয়ানমারে সামরিক যন্ত্রপাতি বিক্রি[৮] ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের রাশিয়ায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে একটি চুক্তি

স্বাক্ষর করা হয় (Parameswaran, 2018)। নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারকে সমর্থন করার আরেকটি কারণ হলো রাশিয়া চায় চীনের পাশাপাশি একটি 'সমান্তরাল নীতি প্রচেষ্টা' চালিয়ে যেতে। কারণ রাশিয়ার চাওয়া হলো চীনের সঙ্গে চমৎকার অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক থাকুক (Wishnick, 2018 : 371)। মিয়ানমারের পক্ষ নিলে রাশিয়া সরাসরি লাভবান হয়। কারণ, এর ফলে চীনের সঙ্গে তার আস্থার সম্পর্ক বাড়ে এবং রাশিয়ার অস্ত্র বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৬ সালে মিয়ানমারের কাছে ১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে রাশিয়া (Wishnick, 2018 : 374)। আর ২০১৭ সালে ৩৮ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে মিয়ানমারের তেল ও গ্যাস প্রকল্পে (Wishnick, 2018 : 375)। পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার যুক্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটকে দুর্বল করা (Wishnick, 2018 : 363)।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ভারত। দেশটি মিয়ানমারের প্রতিবেশীও। সেও মিয়ানমারের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের 'লুক ইস্ট পলিসি' গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করা (Ramya, 2018)। এই অঞ্চলে ভারতের প্রবেশের জন্য একমাত্র ভৌগোলিক সংযোগ হলো মিয়ানমার। এই নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে মিয়ানমার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। রাখাইন প্রদেশে সিত্তে বন্দর নির্মাণে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে ভারত। এখন সেই বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যও ভারত প্রস্তুত (Chaudhury, 2019)। কলকাতা-মিয়ানমার-মিজোরামের মধ্যে একটি বিকল্প সমুদ্রপথ তৈরি করেছে এই সিত্তে বন্দর (Ramya, 2018)। কালাদান মাল্টি মডেল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের অংশ এই বন্দর।

সিত্তে বন্দর নির্মাণের মাধ্যমে ভারত সমুদ্রপথে মিয়ানমারের সঙ্গে যেমন দূরত্ব কমিয়েছে, তেমনি তার নিজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গেও দূরত্ব কমাতে পেরেছে। ভবিষ্যতে মিয়ানমার-আসাম-শিলিগুড়ির মধ্যে কালাদান প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক করিডর হিসেবে রাস্তা ও হাইওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। আর এই রাস্তা ভারতের জাতীয় হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিকতা এবং সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব (আরটুপি)

নিরাপত্তা পরিষদের আইনি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া চীন ও রাশিয়ার আর্থরাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বিবেচনা করে বলা যায় রোহিঙ্গা সংকট স্থায়ীভাবে অবসান করার মতো অবস্থা নিরাপত্তা পরিষদের নেই। এটা শুধু রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রেই নয়। যেখানেই মানবিক সংকট দেখা দেয়, সেখানেই

নিরাপত্তা পরিষদ নির্দিষ্ট ঘটনার ভিত্তিতে বিক্ষিপ্তভাবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। আর এর ভিত্তি হলো জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের বিধানগুলো। সমসাময়িক বিশ্বের সংঘাতের ধরন এবং ব্যক্তির অনিরাপত্তার উৎস বিচারে এসব বিধান অনেক ক্ষেত্রেই স্ববিরোধী। ফলে মানবিক সংকট ঠেকানোর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগ ছাড়াও অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমোদনের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের আচরণ হয়ে গেছে বিতর্কিত এবং সামঞ্জস্যহীন। পুরো ব্যাপারটাই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের রাজনীতির বিষয়। বিশেষ করে যখন সংঘাতের ধরন হয় অভ্যন্তরীণ। এ অবস্থায় প্রশ্ন হলো, তাহলে রোহিঙ্গা পরিস্থিতির মতো মানবিক সংকট মোকাবিলায় সাংগঠনিকভাবে জাতিসংঘের আর কী ব্যবস্থা আছে।

বিভিন্ন পণ্ডিত মতামত দিচ্ছেন যে মানবিক ও মানবাধিকার বিষয়গুলোর সমাধানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ে সাধারণ পরিষদ বেশি যোগ্য অঙ্গসংগঠন (Krasno and Das, 2008; Ramsden, 2016; White, 2015)। কারণটা খুব সহজ। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মানবাধিকার বিষয়ে সাধারণ পরিষদ বহু বছর ধরে বহু রেজল্যুশন পাস করেছে।

১৯৪৮ সালে এই সাধারণ পরিষদই ২১৭ এ(III) নম্বর রেজল্যুশনের বলে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মতো বিখ্যাত দলিল প্রণয়ন করেছে। ১৯৬৬ সালে ২২০০ এ(XXI) নম্বর রেজল্যুশনের বলে সাধারণ পরিষদ দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকল গ্রহণ করে। একটি হলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি আর অন্যটি হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি। মানবাধিকার ডিসকোর্সে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং তাৎপর্যপূর্ণ দলিল প্রতিষ্ঠা করেছে এই সাধারণ পরিষদ। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালে ২৬০ এ(III) নম্বর রেজল্যুশনের বলে গণহত্যার মতো অপরাধ প্রতিরোধ ও সাজাবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৬৫ সালে ২১০৬(XX) নম্বর রেজল্যুশনের বলে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৭৯ সালে ৩৪/১৮০ নম্বর রেজল্যুশনের বলে নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৮৯ সালে ৪৪/২৫ নম্বর রেজল্যুশনের বলে শিশু অধিকারবিষয়ক কনভেনশন এবং ২০০৬ সালে এ/আরইএস/৬১/১০৬ নম্বর রেজল্যুশনের বলে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক কনভেনশন। এ ছাড়া সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক কমিটির (SOCHUM) সঙ্গে সাধারণ পরিষদ সম্পৃক্ত রয়েছে। এই কমিটিকে বলা হয় থার্ড কমিটি। এর কাজ হলো শরণার্থী, শিশু অধিকার, জাতিগত বৈষম্য, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা।

সাধারণ পরিষদ ২০০৫ সালে ৬০/১ নম্বর রেজল্যুশন বলে ওয়ার্ল্ড সামিট আউটকাম ডকুমেন্ট গ্রহণ করে (UN General Assembly, 2005)। নিজের দেশের জনগণকে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূল থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব নির্ণয়ে এই ডকুমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (UN General Assembly, 2005)। মানবাধিকার, শান্তি, নিরাপত্তা, আইনের শাসন, ও উন্নয়নের ধারণাগুলো এই আউটকাম ডকুমেন্টে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সাধারণ পরিষদের ভূমিকাও পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ২০১২ সালে এ/আরইএস/৬৬/২৯০ নম্বর রেজল্যুশন অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ মানব নিরাপত্তা বিষয়েও একটি পদক্ষেপ নেয়। ২০০৫ সালের আউটকাম ডকুমেন্টের ফলোআপ ছিল এই রেজল্যুশন।

এই পরিস্থিতিতে, মানবিক সংকটকালে সাধারণ পরিষদ কীভাবে কাজ করতে পারে, সেই বিষয়ে জাতিসংঘের সনদ এবং এর সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়াও অন্য ব্যবস্থাগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

জাতিসংঘ সনদ ও সাধারণ পরিষদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিধানগুলো

জাতিসংঘ সনদের ১০ থেকে ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী মানবিক সংকট এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে দৃঢ়ভাবে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে সাধারণ পরিষদের (Krasno and Das, 2008: 182)। ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী 'জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে সনদের অধীন যেকোনো বিষয় বা প্রশ্ন' নিয়ে আলোচনা করার এখতিয়ারও রয়েছে (United Nations, n.d.: Chapter IV)। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যদি ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে বা মানবিক সংকটকালে নিষ্ক্রিয় থাকে, তা-ও আলোচনা করার এখতিয়ার রয়েছে সাধারণ পরিষদের।

একইভাবে, ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে যেকোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা বিষয় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহিংসতা নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা রয়েছে এই পরিষদের (United Nations, n.d.: Chapter IV)। ১০ ও ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের সদস্য এমনকি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য অথবা দুই পরিষদের সদস্যদেশগুলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারে (White, 2015: 306)। এই নীতি সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের অধীন নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক পদক্ষেপের মতো ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রোহিঙ্গা বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিধান হলো সনদের ১০ ও ১১ নম্বর ধারাগুলো। সর্বজনীন সদস্য-সংবলিত হওয়ায় সাধারণ

পরিষদ সহিংসতা বন্ধে মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং শরণার্থীদের নিরাপদ পুনর্বাসনের শর্ত তৈরি করার সুপারিশ করতে পারত (এখনো পারে)। এ জন্য যা দরকার তা হলো সক্রিয়ভাবে সাধারণ পরিষদের সক্ষমতা চর্চা ও প্রয়োগের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক আইন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানবাধিকার ও জাতি, লিঙ্গ, ভাষা বা ধর্মনির্বিশেষে ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা রয়েছে সাধারণ পরিষদের (United Nations, n.d. : Chapter IV)। নির্দিষ্ট করে বললে, এই বিধানের মানে হলো, মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে সনদের আলোকে নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট খুব একটা স্পষ্ট নয়। ১৩ নম্বর ধারায় 'শান্তির প্রতি হুমকি', 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ' বা 'আগ্রাসনকর্ম' ইত্যাদি ভাষা বা শব্দ নেই। এই ধারা অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ চাইলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই ধরনের সংঘাতের ঘটনাই বিবেচনায় নিতে পারে। এ ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনের মতো বিস্তৃত বিষয়গুলোও আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের আওতায় কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে 'শান্তির প্রতি হুমকি', 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ' বা 'আগ্রাসনকর্ম' ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এসব সত্ত্বেও, সনদের ১(১) নম্বর ধারার আওতায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সাধারণ পরিষদ সামষ্টিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। এই ধারায় নির্দিষ্ট করে বলা নেই জাতিসংঘের কোন অঙ্গসংগঠন সামষ্টিক পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব নেবে। ব্যাখ্যা করলে নিরাপত্তা পরিষদের পাশাপাশি সাধারণ পরিষদেরও এই এখতিয়ার রয়েছে (Ramsden, 2016 : 281)। একইভাবে ২৪ নম্বর ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রথম দায়িত্ব বর্তায় নিরাপত্তা পরিষদের ওপর। তাহলে এর ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের পরেই সাধারণ পরিষদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় (Ramsden, 2016 : 281)।

তবে ভিন্ন যুক্তি আসতে পারে এ রকম যে ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যতক্ষণ না নিরাপত্তা পরিষদ রোহিঙ্গা বিষয়ে আলোচনা করছে, ততক্ষণ সাধারণ পরিষদ এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে না (Ramsden, 2016 : 281)। এর বিপরীতে আমাদের যুক্তি হলো, নিরাপত্তা পরিষদ সময়মতো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। মিয়ানমার সরকারের ওপর কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নিতেও নিরাপত্তা পরিষদ অনিচ্ছুক। এর ফলে রোহিঙ্গা সংকট নিজের আওতায়

নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের বৈধ যুক্তি তৈরি হয়েছে। এখন সাধারণ পরিষদ চাইলে রোহিঙ্গা বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে কিংবা সাধারণ পরিষদেরই সদস্যদেশগুলোর কাছে সরাসরি সুপারিশ করতে পারে। তা ছাড়া আগেরকার ঘটনা থেকে দেখা যায়, নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা চলছে, এমন বিষয়েও সাধারণ পরিষদ রেজল্যুশন গ্রহণ করতে পারে (White, 2015 : 303)।

সবশেষে, ১৪ নম্বর ধারা অন্য যেকোনো ধারার চেয়ে সাধারণ পরিষদের ভূমিকা বেশি সম্প্রসারিত করে দিয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সবচেয়ে যোগ্য বিকল্প সাধারণ পরিষদই, বিশেষ করে যখন কোনো সংঘাত একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়—এই বিবেচনায় নিরাপত্তা পরিষদ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম নয়। ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী 'কোনো পরিস্থিতির উৎস যা-ই হোক, এর শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি' এবং সেসব পরিস্থিতি যা 'স্বাভাবিক মঙ্গল বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক' বিঘ্নিত করে, তা রোধে সাধারণ পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে (United Nations, n.d. : Chapter IV)। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এসব সংঘাত আন্তরাষ্ট্রীয় বা কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ—যা-ই হোক না কেন, সাধারণ পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবে।

১৪ নম্বর ধারায় আরও বলা আছে, 'জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসংবলিত বর্তমান সনদের কোনো বিধান লঙ্ঘনের' ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে সাধারণ পরিষদের (United Nations, n.d. : Chapter IV)। এর মানে হলো জাতিসংঘের কোনো সদস্যদেশ যদি সনদের উদ্দেশ্য ও নীতির বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সাধারণ পরিষদ তাকে দায়বদ্ধ করতে পারে। এর ফলে সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ক্ষমতাসংক্রান্ত যেসব বিষয় বর্ণিত আছে, সাধারণ পরিষদের আওতা তার বাইরেও বিস্তৃত করার সুযোগ রয়েছে। ১৪ নম্বর ধারার আওতায় সাধারণ পরিষদ অন্তত স্বীকার করতে পারে যে মিয়ানমার সরকার জাতিসংঘ সনদের মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করছে। কারণ, তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নৃশংসতা চালিয়ে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে।

সাধারণ পরিষদ এবং সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব

সুরক্ষার দায়িত্ব বা রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট (আরটুপি) রেজল্যুশন গ্রহণের ঘটনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা (Bellamy, 2010 : 143)।[৯] এই রেজল্যুশন উল্লেখযোগ্য হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, জাতিসংঘ সনদে অহস্তক্ষেপ নীতি, সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা এবং মানবাধিকার সমুন্নত করার বিষয়ে যেসব ব্যত্যয় রয়েছে, সেগুলো সারানোর চেষ্টা করা হয়েছে সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বের আওতায় কোনো

রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার চেয়ে ব্যক্তির সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মানবাধিকারের ভয়াবহ লঙ্ঘন এবং গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূলের মতো ভয়ানক অপরাধ থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়াই এই তত্ত্বের অগ্রাধিকার।

তৃতীয়ত, সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বে সার্বভৌমত্বের ধারণার নতুন এক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণত ভাবা হয়, অন্য রাষ্ট্রের আগ্রাসন থেকে একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সুরক্ষা এবং যেকোনো ধরনের আগ্রাসন থেকে জনগণকে রক্ষার দায়িত্ব শুধুই সেই রাষ্ট্রের। কিন্তু সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব এর বাইরে গিয়ে নতুন দ্যোতনা তৈরি করেছে। চতুর্থত, যদি কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়, অথবা যদি রাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পৃথিবীর সব দেশের দায়িত্ব হলো সেই জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা। সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে (Bellamy, 2010 : 145)।

সবশেষে, ২০০৬ সালে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ১৬৭৪ নম্বর রেজল্যুশন গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে ২০০৫ সালের ওয়ার্ল্ড সামিট আউটকাম ডকুমেন্টের ১৩৮ ও ১৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলোয় গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূলের মতো ঘটনা থেকে বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার কথা বলা আছে (United Nations and the Rule of Law, 2006)। ১৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এসব অপরাধের ঘটনায় সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের আওতায় কূটনৈতিক, মানবিক এবং অন্যান্য শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া জাতিসংঘের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.c)। 'সময়মতো এবং চূড়ান্তভাবে প্রতিটি ঘটনা আলাদা আলাদা ভিত্তিতে' বিচার করে সপ্তম অধ্যায়ের বিধান প্রয়োগ করার অনুমোদন যেমন দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদকে, তেমনি বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে (United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, n.d.c)।

মিয়ানমারের ঘটনায় নিরাপত্তা পরিষদ এসব কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিরাপত্তা পরিষদের কাছে রাখাইন প্রদেশে সহিংসতা বন্ধের সুপারিশ করতে পারে সাধারণ পরিষদ। এ ছাড়া মিয়ানমারে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূলের ব্যাপারে গঠিত কমিশনকে স্বীকৃতি ও তদন্ত করার সুপারিশও করতে পারে। সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব ব্যবহার করে সাধারণ পরিষদ চাইলে মিয়ানমারে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে যথাযথ আইনি পদ্ধতি তৈরি করার সুপারিশ করতে পারে। কার্যকর পদ্ধতিতে

মানবিক সংকট সমাধানে সাধারণ পরিষদ চাইলে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে। আর তা হলো কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্তের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ওপর নির্ভরতা কমানো (Khan and Ahmed, 2018)। এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদের অভ্যন্তরে যেই স্বার্থের রাজনীতি রয়েছে, তার বিরুদ্ধেও ভারসাম্য আনা যাবে (Khan and Ahmed, 2018)।

তবে সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব এখনো বিকশিত ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই তত্ত্ব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য দুর্বলতাও রয়েছে। আউটকাম ডকুমেন্টের ১৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের ভাষা এ রকম যে এখানে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিটি ঘটনা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে রাখা হয়েছে। ফলে যেকোনো পদক্ষেপই ভেটো ক্ষমতার আওতাভুক্ত। এমনকি যখন সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব প্রয়োগ করা হবে, তখনো। তবে আমাদের যুক্তি হলো যদি সাধারণ পরিষদ সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বের আওতায় মিয়ানমার সরকার কর্তৃক গণনৃশংসতার পর্যাপ্ত প্রমাণসহকারে কোনো সুপারিশ করে, তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের ভেটো দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদ তার নিজেরই গৃহীত ১৬৭৪ নম্বর রেজল্যুশন অনুযায়ী সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব অনুসরণ করতে বাধ্য। আরেকটি কারণ হলো সাধারণ পরিষদ অতীতে শান্তি ও নিরাপত্তাবিষয়ক বহু ঘটনায় নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ করেছে (United Nations Security Council, n.d.)।

২০০৬ সালে ১৬৭৪ নম্বর রেজল্যুশন গ্রহণের পর থেকে নিরাপত্তা পরিষদ বেশ কয়েকটি শান্তি কার্যক্রমে সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব প্রয়োগ করেছে। যেমন ২০০৬ সালে দারফুর, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে কেনিয়া, ২০১১ সালে আইভরিকোস্ট, ২০১১ সালে ইয়েমেন, ২০১২-২০১৩ সালে মালি, ২০১১ সালে সুদান, ২০১১ সালে লিবিয়া এবং ২০১৩ সালে দক্ষিণ সুদানে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেছে নিরাপত্তা পরিষদ। তবে লিবিয়ার ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনাও ছিল। কারণ, অনেকের মতে লিবিয়ায় সরকার বদল ছিল মূল কারণ, গণনৃশংসতা ঠেকানো নয় (Bellamy and Williams, 2011 : 847)। এসব সত্ত্বেও, লিবিয়াই প্রথম ঘটনা যেখানে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়াই বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (Bellamy and Williams, 2011 : 825)। জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বলা আছে, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সম্মতিতে সামরিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এই বিধানের সমালোচনা করা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। কারণ, এর ফলে জাতিসংঘের সেনা মোতায়েন হয়ে পড়ে অনিয়মিত এবং প্রায়ই দেখা যায় সরকারের বাইরের গোষ্ঠীগুলোর ওপর শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি এটা জানার পরও যে সরকারি সৈন্যরাও বেসামরিক লোকদের ওপর নৃশংসতার জন্য

সমানভাবে দায়ী (Bellamy and Williams, 2011 : 828)।

১৯৯৯ সাল থেকেই স্বীকৃত সরকারের সম্মতিতে জাতিসংঘ মিশন প্রেরণ করে আসছে। যেসব দেশে মিশন প্রেরণ করা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে সিয়েরা লিয়ন, হাইতি, বুরুন্ডি, লাইবেরিয়া, সুদান, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী কঙ্গো ও আইভরিকোস্ট। রোহিঙ্গা সংকটে লিবিয়ার উদাহরণ কাজে লাগানো যায়, যেখানে ক্ষমতাসীন সরকারের সম্মতি ছাড়াই বেসামরিক নাগরিকের সুরক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করা যাবে।

সাধারণ পরিষদের জন্য আরেকটি বিকল্প হলো 'শান্তির জন্য ঐক্য' (Uniting for Peace") নীতি।[১১] কোরীয় যুদ্ধের সময় এই নীতি ব্যবহার করে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করেছিল। স্নায়ুযুদ্ধের রেষারেষির কারণে সে সময় নিরাপত্তা পরিষদ হস্তক্ষেপের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তখন সাধারণ পরিষদ এই নীতি আহ্বান করেছিল। এই নীতিতে বলা আছে, যদি নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সাধারণ পরিষদ দ্রুত সেই বিষয় বিবেচনায় নিতে পারে এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহাল করতে সব সদস্যদেশকে সামষ্টিক পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করতে পারে (General Assembly of the United Nations, n.d.)।

এই নীতির অধীনে, আগ্রাসন বন্ধে সাধারণ পরিষদ সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করতে পারে। এমনকি অপরাধীদের বিচারের জন্য অভিযুক্ত করতে পারে। এটা হতে পারে সনদের চতুর্থ অধ্যায়ের ২০ নম্বর ধারার অধীনে একটি বিশেষ সভা পরিচালনা করার মাধ্যমে, অথবা ৩৭৭-এ রেজল্যুশনের ('শান্তির জন্য ঐক্য' নীতি) অধীনে একটি জরুরি সভা পরিচালনা করার মাধ্যমে (General Assembly of the United Nations, n.d.)। এসব সভা হতে পারে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের বেশির ভাগ সদস্যদেশের অনুরোধের ভিত্তিতে (Special sessions of the General Assembly of the UN, n.d.)। এই উদাহরণ থেকে দেখা যায়, সাধারণ পরিষদ চাইলে যেকোনো বিষয় তার সভায় উত্থাপন করে আলোচনা করতে পারে। এমনকি শান্তি ও নিরাপত্তার মতো বিষয় হলেও সেটা সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণ পরিষদের বর্ণিত কার্যক্রমে জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা তার রয়েছে। সেসব বিষয়ে সুপারিশ করা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে নতুন কোনো গবেষণা প্রয়োজন হলে সেটাও শুরু করতে বলার ক্ষমতা রয়েছে সাধারণ পরিষদের (General Assembly of the United Nations, n.d.)।

১৯৫০ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেরিত জাতিসংঘের মিশন চালু রাখার বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল, তখন প্রথম সাধারণ পরিষদ শান্তির জন্য ঐক্য রেজল্যুশন পাস করায় (Krasno and Das, 2008 : 181)। শান্তি ও

নিরাপত্তা পুনর্বহাল বা বজায় রাখার জন্য সব সদস্যদেশকে তাদের সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে সামষ্টিক পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করা হয় (Krasno and Das, 2008 : 181)। শান্তির জন্য ঐক্য নীতি আহ্বানের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট।

নিরাপত্তা পরিষদে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার পর সাধারণ পরিষদ ১৯৫৬ সালের ৭ থেকে ১০ নভেম্বরব্যাপী একটি জরুরি সভা আহ্বান করে। সেখানে দাবি করা হয় যেন মিসর থেকে দ্রুত ইসরায়েলি, ফরাসি ও ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় (Krasno and Das, 2008 : 183)। এর বাইরেও সাধারণ পরিষদ মিসরে বাফার জোন বা নিরপেক্ষ অঞ্চল তৈরি করার জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে (Krasno and Das, 2008 : 183)।

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক জরুরি সভা ডাকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৮১ সালে ইএস-৮/১ রেজল্যুশন গ্রহণের সময়। এই রেজল্যুশনে চিহ্নিত করা হয় যে দক্ষিণ আফ্রিকা 'বিনা প্ররোচনায় অ্যাঙ্গোলায় সশস্ত্র আগ্রাসন' চালাচ্ছে। সদস্যদেশগুলো যেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই নতুন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় 'সামরিক সহায়তা' দেয়, তার আহ্বান জানানো হয় এই রেজল্যুশনে (Ramsden, 2016 : 281)। ২০০৩ সালে সাধারণ পরিষদ যখন ইএস-১০/১৪ রেজল্যুশন গ্রহণ করে, তখনো জরুরি সভা ডাকা হয়। এটা ছিল সাধারণ পরিষদের ১০তম জরুরি সভা। সেখানে ফিলিস্তিনের দখল হওয়া ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দেয়াল নির্মাণের আইনি ভিত্তি নিয়ে উপদেশমূলক মতামত চাওয়া হয় আন্তর্জাতিক সালিস আদালতের কাছে (International Court of Justice, 2004)। আন্তর্জাতিক সালিস আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ সনদের ৯৬(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী উপদেশমূলক মতামত চাওয়ার এখতিয়ার রাখে।

এ ছাড়া ১০(২) ও ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ীও সাধারণ পরিষদের এই সক্ষমতা রয়েছে (International Court of Justice, 2004)। উপসংহারে আন্তর্জাতিক সালিস আদালত জানায়, যদি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ৩৭৭ এ(V) রেজল্যুশনের আওতায় সাধারণ পরিষদ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তার সদস্যদেশের কাছে সুপারিশ পাঠাতে পারে (International Court of Justice, 2004)।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে আমাদের যুক্তি হলো মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

মানবিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে রাজনৈতিকভাবে বা আইনগতভাবে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখার মতো অবস্থায় নেই। এর কারণ জাতিসংঘের প্রচ্ছন্ন কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক রাজনীতি ও সংঘাতের পরিবর্তনশীল বাস্তবতা এবং চীন ও রাশিয়ার আর্থরাজনৈতিক স্বার্থ। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য তাদের ক্ষমতার রাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থ অনুসরণ করতে গিয়ে জাতিসংঘের কার্যক্রমে প্রায়ই বাধা সৃষ্টি করে থাকে। বিষয়টি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আরও আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে জাতিসংঘ সনদের দ্ব্যর্থবোধকতার কারণে যেসব ব্যাখ্যা হাজির হয়, সেগুলো নিরাপত্তা পরিষদের আশু ও সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু এর মানে কি এই যে মানবিক সংকটে জাতিসংঘের পদক্ষেপ গ্রহণ, মধ্যস্থতা করা বা হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই? এই প্রবন্ধের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে জাতিসংঘ সনদে সাধারণ পরিষদকে সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্ব গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে জাতিসংঘের মানবিক ভূমিকা এগিয়ে নেওয়ার একটি বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। এই স্পন্দনশীল ধারণায় বর্তমান দুনিয়ার সব ধরনের মানবিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। এখানে বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুসারেই গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বে জাতিসংঘের সময়মতো হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এই হস্তক্ষেপে জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংগঠন—নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ—দুটোই কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। অতীতে সাধারণ পরিষদ বহু রেজল্যুশন গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও নীতি সমুন্নত করতে ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদের বর্ধিত দায়িত্ব পালন করার সুযোগ সনদের বিধানে রয়েছে। এ বিষয়টিও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রায় সর্বজনীন সদস্যপদ-সংবলিত হওয়ায় এই বিষয়ে সবচেয়ে যোগ্য অঙ্গসংগঠন। জাতিসংঘের সদস্যরা অন্তত সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে একটি রেজল্যুশন পাস করাতে পারে। এর পর্যাপ্ত সুযোগও রয়েছে। এর ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, জাতিগত নির্মূল এবং নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে মিয়ানমার সরকারকে অভিযুক্ত করা যায়। তাহলে সুরক্ষার দায়িত্ব তত্ত্বের আদর্শ অনুসারে মিয়ানমার সরকারের আচরণ বদলাতে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের একটি নৈতিক ভিত্তি তৈরি হবে। তা না হলে বৈশ্বিক সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘের অস্তিত্ব, মানবিক ও মানবাধিকার আইন বিষয়ে যাবতীয় আলোচনা এবং গুরুতর অপরাধের বিচার

বিষয়ে যেই কাঠামো আছে, তা সবই নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে।

(মূল প্রবন্ধটি সেজ জার্নাল কর্তৃক *এশিয়ান জার্নাল অব কমপারেটিভ পলিটিকস* সাময়িকীতে ২৬ আগস্ট ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে)

টীকা

১. প্রথম ১৯৭৮ সালে, পরে আবার ১৯৯১-১৯৯২ সালে।

২. ইন্দোনেশিয়ার মারজুকি দারুসমান ছিলেন এর চেয়ারপারসন, আর শ্রীলঙ্কার রাধিকা কুমারস্বামী ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার সিদোতি ছিলেন এর সদস্য।

৩. অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, ট্রাস্টিশিপ বা অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক সালিস আদালত এবং সচিবালয়।

৪. এই অর্থে এথনোসেন্ট্রিক যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও সংস্কৃতির আলোকে এসব ধারণার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

৫. সিয়েরা লিয়নে নিরাপত্তা পরিষদ ধীরে ধীরে সৈন্য মোতায়েন বাড়িয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৭ হাজার ৩৬৮ জন সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। এই মিশন শেষ হয় ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। খরচ হয়েছিল আনুমানিক ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিস্তারিত দেখুন : https ://peacekeeping.un.org/mission/past/unamsil/facts.html। ২০০২ সালের ২০ মে নিরাপত্তা পরিষদ পূর্ব তিমুরে মিশন অনুমোদন করে। শেষ হয় ২০০৫ সালের ২০ মে। সেখানে মোট পাঁচ হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয় এবং আনুমানিক খরচ দাঁড়ায় ৫৬ কোটি ৫৪ লাখ ৯৭ হাজার ৯০০ মার্কিন ডলার। বিস্তারিত দেখুন : https ://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/facts.html। তবে রুয়ান্ডার ক্ষেত্রে যখন গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছিল, তখনই মূলত জাতিসংঘ তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। শুরুর দিকে ছিল ২ হাজার ৫০০ সৈন্য। পরে তা কমে দাঁড়ায় ২৭০ জনে। বিস্তারিত দেখুন : https ://peacekeeping.un.org/misssion/past/unamirS.htm।

৬. বলপ্রয়োগের মতো অপারেশন চালানোর জন্য মিয়ানমারের দুই প্রতিবেশী দেশ চীন ও ভারত সামরিকভাবে সবচেয়ে সক্ষম।

৭. বেশ কিছু গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের দায়ে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দাসকো তাদিককে অভিযুক্ত করে। এগুলো হলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘন এবং যুদ্ধের রীতি লঙ্ঘন। জাতিসংঘই মূলত এই ট্রাইব্যুনাল গঠনের অনুমোদন দেয়। উদ্দেশ্য ছিল এই ট্রাইব্যুনালের বিচারিক সিদ্ধান্তগুলো আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা এবং ভবিষ্যতের গৃহযুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ সংঘাতের পরিস্থিতিতে এগুলো প্রয়োগ করা। এ জন্য দেখুন সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (১৯৯৭)।

৮. রাশিয়ার কাছ থেকে মিয়ানমার যেসব সামরিক সরঞ্জাম কিনেছে, সেগুলো হলো ফাইটার জেট, ইয়াকোভলেভ ইয়াক-১৩০ (মিটেন) যুদ্ধ প্রশিক্ষণের বিমান এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম, এবং সু-৩০ বিমান।

৯. ২০০৫ সালে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড সামিটে রেজল্যুশনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। সাধারণ পরিষদের ইতিহাসে এটা ছিল রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সবচেয়ে বড় জমায়েত।

১০. ১৬৭৪ নম্বর রেজল্যুশনে বলা আছে, '...সশস্ত্র সংঘাত পরিস্থিতিতে বেসামরিক ও অন্যান্য সুরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুচিন্তিতভাবে লক্ষ্যবস্তু বানানো এবং আন্তর্জাতিক মানবিক ও মানবাধিকার আইনের পদ্ধতিগত, নিদারুণ ও ব্যাপক লঙ্ঘনের অনুমোদনের ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। জাতিসংঘ এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি পুনরায় ব্যক্ত করছে' (United Nations and the Rule of Law, 2006)।

১১. শান্তির জন্য ঐক্য রেজল্যুশনে বলা হয়েছে, 'শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ, অথবা আগ্রাসন কর্মের মতো পরিস্থিতিতে যদি নিরাপত্তা পরিষদ স্থায়ী সদস্যদের সর্বসম্মতির অভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার মূল দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সাধারণ পরিষদ অতিসত্বর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সামষ্টিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সদস্যদেশগুলোর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহাল বা বজায় রাখতে যদি শান্তিভঙ্গ বা আগ্রাসনকর্ম হয়ে থাকে, তাহলে সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারের সুপারিশও করতে পারবে' (cited in Ramsden, 2016 : 278-279)।

গ্রন্থপঞ্জি

Associated Press and Agence France-Presse (2017) Myanmar treatment of Rohingya looks like 'textbook ethnic cleansing', says UN. *The Guardian*, 11 September. Available at : https ://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/un-myanmars-treatment-of-rohingya-textbook-example-of-ethnic-cleansing (accessed11 August 2018).

BBC News (2017) UK suspends aid for Myanmar military. Available at : https :// www.bbc.com/news/uk-41326179 (accessed 4 July 2019).

Bellamy AJ (2010) The responsibility to protect—5 years on. Ethics and International Affairs 24(2) : 143-169.

Bellamy AJ and Williams PD (2011) The new politics of protection? Cote d'Ivoire, Libya and the responsibility to protect. *International Affairs* 87(4) : 825-850.

Chaudhury DR (2019) India all set to take over ops in Myanmar's Sittwe Port after Chabahar. *The Economic Times*, 9 January. Available at : https :// economictimes.indiatimes.com/news/defence/indiaall-set-to-take-over-ops-in-myanmars-sittwe-port-after-chabahar/articleshow/67437859.cms (accessed 5 July 2019).

Dag Hammarskjold Library (n.d.) Security Council quick links. Security Council-veto list. Available at :
https ://research.un.org/en/docs/sc/quick (accessed 3 July 2019).

Daily Star (2018a) No excuse for delaying solution. 30 August. Available at : https ://www.thedailystar.net/news/rohingya-crisis/unsc-urged-work-myanmar-end-horrendous-sufferings-rohingyas-1626058 (accessed 1 September 2018).

Daily Star (2018b) UN to gather evidence on genocide in Myanmar. 12 March. Available at : https ://www.thedailystar.net/backpage/un-gather-evidence-genocide-myanmar-1546840 (accessed 10 April 2018).

Embassy of the Republic of the Union of Myanmar (2018) Press release on the application by the International Criminal Court (ICC) prosecutor to claim jurisdiction over the alleged deportation of the Muslims from Rakhine to Bangladesh. 13 April. Available at : http ://memoscow.org/index.php/en/rakhine-news/240-press-release-on-the-application-by-the-international-criminal-court-icc-prosecutorto-claim-jurisdiction-over-the-alleged-deportation-of-the-muslims-from-rakhine-to-bangladesh (accessed 3 March 2018).

Encyclopedia Britannica (n.d.) Rohingya. Available at : https ://www.britannica.com/ topic/Rohingya (accessed 14 July 2019).

Ganesan N (2018) Bilateral issues in Myanmar's policy towards China. Occasional paper no. 38. Southeast Asian Studies, University of Freiburg. Available at : https ://www.eu-china.net/uploads/tx_news/OP_38_-_Ganesan_-_Bilateral_Issues_in_Myanmar_s_Policy_towards_China.pdf (accessed 9 July 2019).

General Assembly of the United Nations (n.d.) Functions and powers of the General Assembly of the UN. Available at : http ://www.un.org/en/ga/about/background.shtml (accessed 2 April 2018).

GlennonM(2015) The limitations of traditional rules and institutions relating to the use of force. In : Weller M (ed.) *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*. Oxford : Oxford University Press, pp. 79-94.

Global New Light of Myanmar (2018) One Belt-One Road Initiative and Myanmar : Connectivity synergy issue and potentialities. 11 March. Available at : http ://www.globalnewlightofmyanmar.com/one-belt-oneroad-initiative-myanmar-connectivity-synergy-issue-potentialities/ (accessed 4 May 2018).

Gorenburg D and Schwartz P (2019) Russia's strategy in Southeast Asia. *PONARS Eurasia*, policy memo 578. Available at : http ://www.ponarseurasia.org/memo/russias-strategy-southeast-asia (accessed 9 July 2019).

Guardian (2017a) China and Russia oppose UN resolution on Rohingya. 24 December. Available at : https ://www.theguardian.com/world/2017/dec/24/china-russia-oppose-un-resolution-myanmar-rohingya-muslims (accessed 7 July 2018).

Guardian (2017b) The UN Chief urges Myanmar to end military operations in Rohingya crisis. 28 September. Available at : https ://www.theguardian.com/world/2017/sep/28/un-chief-calls-for-end-to-myanmar-military-operations-in-rohingya-crisis (accessed 7 July 2018).

Guardian (2018) Hallmarks of genocide : ICC prosecutor seeks justice for Rohingya. 10 April. Available at : https ://www.theguardian.com/world/2018/apr/10/rohingya-crisis-icc-prosecutor-seeks-power-toinvestigate-crimes-against-humanity (accessed 10 July 2018).

Gurr TR (2007) Minorities, nationalists, and Islamists : Managing communal conflict in the twenty first century. In : Crocker C, Hampson FO and Aall P (eds) *Leashing the Dogs of War : Conflict Management in a Divided World*. Washington, DC : United States Institute of Peace Press, pp. 131-160.

House of Commons Library (2018) Burma : 2018 update. *Briefing Paper*, 9 January, no. 7901, p. 26. Available at : https ://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7901/CBP-7901.pdf (accessed 14 July 2019).

Indian Express (2017) UN meeting on Myanmar spotlights Security Council divisions. 29 September. Available at : http ://indianexpress.com/article/world/un-meeting-on-myanmar-spotlights-securitycouncil-divisions-4867284/ (accessed 29 July 2018).

International Committee of the Red Cross (ICRC) (n.d.) Treaties, state parties and commentaries : Convention (III) relative to the treatment of prisoners of war. Geneva, 12 August 1949. Available at : https ://ihldatabases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006 (accessed 12 July 2018).

International Court of Justice (2004) *Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory*. Report. Available at : https ://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf (accessed 8 April 2018).

International Criminal Court (ICC) (2011) *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague : ICC.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) (1997) Dusko Tadic sentenced to 20 years' imprisonment. Press release, United Nations International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, CC/PIO/226-E, 14 July. Available at : http ://www.icty.org/en/press/dusko-tadic-sentenced-20-years-imprisonment (accessed 7 July 2018).

Inter-Parliamentary Union (2017) Stop the violence and forced displacement of the Rohingya. 24 September. Available at : https ://www.ipu.org/news/news-in-brief/2017-09/stop-violence-and-forced-displacementrohingya

(accessed 11 August 2018).

Johnstone I (2015) When the Security Council is divided : Imprecise authorizations, implied mandates, and the 'unreasonable veto'. In : Weller M (ed.) *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*. Oxford : Oxford University Press, pp. 227-250.

Khan MT and Ahmed S (2018) Rohingya refugee crisis, the General Assembly and Bangladesh diplomacy. *The Daily Star*, 22 March. Available at : https ://www.thedailystar.net/opinion/perspective/rohingya-refugee-crisis-un-general-assembly-and-bangladesh-diplomacy-1551688 (accessed 4 April 2019).

Krasno J and Das M (2008) The uniting for peace resolution and other ways of circumventing the authority of the Security Council In : Cronin B and Hurd I (eds) *The UN Security and the Politics of Authority*. New York : Routledge, pp. 173-195.

Kudo T (2008) Myanmar's economic relations with China : Who benefits and who pays. In : Skidmore M and Wilson T (eds) *Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar*. Canberra : Australian National University E-Press, pp. 87-112.

Lederer EM (2017) The UN Security Council split on Rohingya crisis. *The Christian Science Monitor* 29. Available at : www.csmonitor.com/World/2017/0929/UN-Security-Council-split-on-Rohingya-crisis (accessed 3 August 2018).

Marston H (2015) Is the US giving Myanmar a free pass? *The Diplomat*. Available at : https ://thediplomat.com/2015/10/is-the-us-giving-myanmar-a-free-pass/ (accessed 2 July 2019).

Min K (2013) China-Myanmar gas pipeline becomes fully operational. *Myanmar Business Today* 1(39). 28 October. Available at : https ://www.mmbiztoday.com/articles/china-myanmar-gas-pipeline-becomesfully-operational (accessed 4 April 2018).

Ocampo LM (2008) Situation in Darfur, the Sudan : Summary of Prosecutor's application under Article 58. International Criminal Court, No. ICC-02/05. Available at : https ://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_03987.PDF (accessed 7 July 2018).

Office of the United States Trade Representatives (n.d.) Burma. Available at : https ://ustr.gov/countriesregions/southeast-asia-pacific/burma (accessed 3 July 2019).

Parameswaran P (2018) What did the Russian Defense Minister's Myanmar visit accomplish? *The Diplomat*, 23 January. Available at :

https ://thediplomat.com/2018/01/what-did-russias-defense-ministers-myanmarvisit-accomplish/ (accessed 4 April 2018).

Park TJ and MacDiarmid V (2016) Selling R2P : Time for action. In : Forrer J (ed.) *The Role of Business in the Responsibility to Protect*. Cambridge : Cambridge University, pp. 35-50.

Peterson HE (2018) Myanmar's military accused of genocide in damning UN report, 27 August. Available at : https ://www.theguardian.com/world/2018/aug/27/myanmars-military-accused-of-genocide-by-damningun-report (accessed 30 September 2018).

Ramsden M (2016) Uniting for peace and humanitarian intervention : The authorizing function of the UN General Assembly. *Washington International Law Journal* 25(2) : 267-305.

Ramya PS (2018) Myanmar's approach to India : A closer look at how Myanmar engages with India and the act east policy. *The Diplomat*, 29 March. Available at : https ://thediplomat.com/2018/03/myanmarsapproach-to-india/ (accessed 2 April 2018).

Reliefweb (2018) Security Council visiting mission to Bangladesh and Myanmar. Report, UN Security Council, 27 April. Available at : https ://reliefweb.int/report/bangladesh/security-council-visiting-mission-bangladesh-and-myanmar (accessed 30 April 2017).

Reliefweb (2019) *Rohingya refugee crisis : The United States contributes over $105 million to the 2019 UN Joint Response Plan [EN/BN]*. Report, US Department of State, 3 March. Available at : https ://reliefweb.int/report/bangladesh/rohingya-refugee-crisis-united-states-contributes-over-105-million-2019-un-joint (accessed 4 July 2019).

Security Council press statement on Security Council visit to Bangladesh, Myanmar (2018). Press Release SC/13331, 9 May 2018. Available at : https ://www.un.org/press/en/2018/sc13331.doc.htm (accessed 10 May 2018).

South China Morning Post (2017) Myanmar pipeline gives China faster supply of oil from Middle East. 12 April. Available at : http ://www.scmp.com/news/china/economy/article/2086837/myanmar-pipelinegives-china-faster-supply-oil-middle-east (accessed 4 April 2018).

Special sessions of the General Assembly of the UN. Available at : http ://www.un.org/en/ga/sessions/special.shtml (accessed 2 April 2018).

Spetalnick M and Brunnstrom D (2018) US imposes sanction on Myanmar military over Rohingya crackdown. *Reuters*, 17 August. Available at : https ://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-usa/usimposes-sanctions-on-myanmar-military-over-rohingya-crackdown-idUSKBN1L21KL (accessed 4 July 2019).

Stanton G (2017) Call it genocide. *The Daily Star*, 20 November. Available at : https ://www.thedailystar.net/opinion/politics/call-it-genocide-1493548 (accessed 4 January 2018).

UN General Assembly (2005) *Resolution adopted by the UNGA on 16 September*. Report, A/RES/60/1. Available at : http ://www.un.org/en/ development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf (accessed 4 January 2018).

UN General Assembly (2017) 72nd session of the Third Committee of the General Assembly : Situation of human rights in Myanmar. A/C.3/72/L.48, 31 October. Available at : http ://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/% 7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7 D/a_c_3_72_l_48.pdf (accessed 2 June 2018).

UN Human Rights Council (2018) Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar, A/HRC/39/64, 12 September. Available at : https ://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/274/54/PDF/G1827454.pdf? (accessed 26 March 2019).

UN Human Rights Office of High Commissioner (n.d.) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Available at : https ://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crimeofgenocide.aspx (accessed 11 July 2019)

UN News (2007) China and Russia veto US/UK-backed Security Council draft resolution on Myanmar. Available at : https ://news.un.org/en/story/2007/01/205732-china-and-russia-veto-usuk-backed-securitycouncil-draft-resolution-myanmar (accessed 3 July 2019).

UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (n.d.a) Crimes against humanity. Available at : https ://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml (accessed 12 January 2018).

UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (n.d.b) Ethnic cleansing. Available at : http ://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.shtml (accessed 12 January 2018).

UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (n.d.c) Responsibility to protect. Available at : http ://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.html (accessed 8 July 2018).

United Nations (n.d.) The UN Charter. Available at : https ://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html (accessed 11 July 2018).

United Nations and the Rule of Law (2006) Security Council resolution 1674 (2006) on protection of civilians in armed conflict. Available at : https ://

www.un.org/ruleoflaw/blog/document/security-council-resolution-1674-2006-on-protection-of-civilians-in-armed-conflict/ (accessed 2 April 2018).

United Nations' Secretary General (2018) Note to correspondents : First official visit of the United Nations Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar, 21 June. Available at : https ://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-06-21/note-correspondents-first-official-visit-united-nations (accessed 11 August 2018).

United Nations Security Council (2017a) *Statement by the President of the Security Council*. Report, 6 November. Available at :

http ://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_prst_2017_22.pdf (accessed 29 July 2018).

United Nations Security Council (2017b) *UN Security Council's 8133rd meeting agenda on the situation in Myanmar*. Report, S/PV.8133, 12 December. Available at : http ://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8133.pdf (accessed 2 June 2018).

United Nations Security Council (2018) UN Security Council's 8179th meeting agenda on the situation in Myanmar. Report, S/PV.8179, 13 February. Available at : http ://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8179.pdf (accessed 4 June 2018).

United Nations Security Council (n.d.) Complete list of recommendations of the UN General Assembly to the UN Security Council. Available at : http ://www.un.org/en/sc/repertoire/relations_organs.shtml (accessed 8 July 2018).

White ND (2015) The relationship between the UN Security Council and the General Assembly in matters of international peace and security. In : Weller M (ed.) *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*. Oxford : Oxford University Press, pp. 293-313.

Wishnick E (2018) The Sino-Russian partnership and the East Asian order. *Asian Perspective* 42 : 355-386.

World Without Genocide (n.d.) The international criminal court. Available at : http ://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/darfur-genocide/icc (accessed 2 February 2018).

ইতিহাস

আসাম-বাংলা সম্পর্ক এবং জাতিবিদ্বেষের ঐতিহাসিক পটভূমির খোঁজে

আলতাফ পারভেজ

আসাম ও বাংলাদেশ একদা ছিল এক দেশ—ভৌগোলিক ও প্রশাসনিকভাবেও। আজকের জাতিবাদী আসামকে বোঝাপড়ার স্বার্থে আমাদের সেই বিবরণে আবার প্রবেশ করতে হচ্ছে। তবে যৌথতার পুরোনো ইতিহাসে অনেক ক্ষত তৈরি করা হয়েছে এবং তার দায়ভার বইতে বাধ্য করা হয়েছে আসামের বাংলাভাষীদের। ২০১৯ সালের আগস্টেই আসামের চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জিতে বাদ পড়া ১৯ লাখ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠই বাংলাভাষী। তারপরও 'বাংলা'-বিদ্বেষ থেমে নেই।

একদা এক 'দেশ' বাংলা-আসামের মধ্যে ইতিমধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কাঁটাতার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ প্রতিমুহূর্তের অবিশ্বস্ত এক নিকট জনপদের নাম। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এই 'পরিবর্তন' ঘটানো হলো, যা এখন আসামে এক বিস্ফোরক অবস্থা তৈরি করে রেখেছে। কিন্তু কারা কী উদ্দেশ্যে এসব পদক্ষেপ নিতে পারল—তার ঐতিহাসিক পটভূমি না বুঝে আমরা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাব না। প্রকৃতই কী বাংলা ও আসামের সম্পর্ক কাঁটাতার দিয়ে পৃথক করার মতো কিছু? ইতিহাস কী বলে? সেটাই খুঁজতে চলেছি আমরা।

বিগত শতাব্দীর শুরুতে ভাষা ও যোগাযোগের বন্ধন

আসাম ও বাংলাদেশের সমকালীন সম্পর্ককে অন্তত চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে, যার প্রথমেই আসে ১৯০৫-পূর্ব পর্যায়।

আসাম ১৮২৬ সাল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসে। কার্যত এটা ছিল বার্মার বামার দখলদারদের হাত থেকে ব্রিটিশ দখলদারদের কাছে হস্তান্তরমাত্র। বাংলা একই শক্তির নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে তারও প্রায় ৭০ বছর



আগে থেকে। অর্থাৎ আসামের আগেই বাংলা ব্রিটিশদের হাতে ছিল। আসামকে পরে বাংলাভাষী বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৩৬ সালে আসামের দাপ্তরিক ভাষা করা হয় 'বাংলা'। ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত আসাম ও বাংলা একসঙ্গেই ব্রিটিশ কলোনি হিসেবে ছিল। আসাম ও বাংলার এই প্রাথমিক প্রশাসনিক যৌথতা ছিল ৪৭ বছরের। ১৮৭৩ সালের পর জর্জ ক্যাম্পবেল দ্বারা বাংলার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষা দাপ্তরিক ভাষা হয়।[১] আসামে বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার প্রেক্ষাপটটি এ পর্যায়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা জরুরি। কারণ, বিষয়টা নাটকীয় হলেও অবাস্তব ছিল না—যদিও তার যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক ছিল।

আসামে ১৯১১ সালের শুমারিতে অসমিয়াভাষীর সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। বাংলাভাষী ছিল ৪৬ শতাংশ।[২] বিদ্যালয়গুলোতে অসমিয়া পড়ালেখারও সুযোগ ছিল কম। দীর্ঘ কয়েক দশক পুরো এলাকাটি ছিল 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র অধীনে। এ রকম পটভূমিতেই সেখানে বাংলা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষিত হয় ১৮৩৬ সালে। এটা বাঙালিরা করেনি। করেছে শাসক ব্রিটিশরা। বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার অন্তত এক দশক এ নিয়ে আসামে কোনো বিরোধিতাও ছিল না। বিরোধিতা তখনই তৈরি হয়, যখন দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের সরকারি চাকরিতে বাংলাভাষীদের প্রাধান্য বাড়ছে এবং অসমিয়াদের উপস্থিতি কমছে। এ সময় মূলত অসমিয়াদের মধ্যে কর্মরত মিশনারিদের মাধ্যমে অসমিয়া দাপ্তরিক ভাষার দাবিটি গতি

পায়। ক্রমে এটা বাংলাবৈরিতা, আরও পরে ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে বাঙালি বিরোধিতা এবং তারও পরে মুসলমান-বাঙালি বিরোধিতায় রূপ নেয়। এ সময় অসমিয়াদের বৈরিতা থেকে মুক্তি পেতে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পশ্চিম আসামে বসবাসকারী দরিদ্র বাংলাভাষীদের একাংশ শুমারিতে 'মাতৃভাষা'র স্থলে অসমিয়া উল্লেখ করে, যাদের মধ্যে ছিল পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া মানুষদের পরবর্তী প্রজন্মও। তারই চিহ্ন হিসেবে লিখিত হয়েছিল স্থানীয় কবি মৌলভি বন্দে আলীর এমন কবিতা :

চেনেহী অসম মাতৃ দিছে স্তন্যধারা
আনন্দতে নাচে মোর হিয়া
গাওঁ আহা সমস্বরে—আমি অসমিয়া
নোহো আর মৈমনচিঙীয়া
[চরুয়ার উক্তি]

কেবল এরূপ প্রবণতার কারণেই ১৯৫১ সালের শুমারিতে আসামে অসমিয়াভাষীর হিস্যা দেখা যায় ৫৭ শতাংশ। আর বাংলাভাষীর হিস্যা দাঁড়ায় ১৭ শতাংশ। এভাবে একদা যাঁরা বাংলায় কথা বলতেন, বাংলায় স্বপ্ন দেখতেন, বাংলায় হিসাব-নিকাশ করতেন—রাতারাতি তাঁদের উত্তরপুরুষদের পরিচয় হয়ে গেল 'অসমিয়া'। পরিবর্তিত এই পরিসংখ্যানের পটভূমিকে আড়াল করেই তখন থেকে এবং এখনো বলা হয়, আসাম ব্যাপকভাবে অসমিয়াপ্রাধান্যপূর্ণ একটা জনপদ। বাংলাভাষীরা হলো 'বিদেশি'। কিন্তু এ শতাব্দীতে এসেও দেখা যাচ্ছে, আসামে অসমিয়া মাতৃভাষা হিসেবে রয়েছে ৫০ শতাংশের কম মানুষের।[৩] তবে 'বাংলা'র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এবং স্কুল-কলেজে বাংলাকে কোণঠাসা করার মধ্য দিয়ে অসমিয়া মধ্যশ্রেণি ইতিমধ্যে নিজেদের সামাজিক অবস্থান অনেক সংহত করে নিতে পেরেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, এই প্রক্রিয়ায় আসামের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে লালন ও সমৃদ্ধ না করে তাকে রাজনৈতিক দলাদলি ও হিংসার পণ্য করা হয়েছে মাত্র এবং তার জন্য প্রথমত ব্রিটিশ শাসকেরা এবং দ্বিতীয়ত ও মুখ্যত স্থানীয় অ-বাংলাভাষীরাই দায়ী।[৪]

সারণি : এক

আসামে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের হিস্যা (বিগত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের চিত্র এবং এক শতাব্দী-পরবর্তী চিত্র)[৫]

শুমারি বছর	বাংলা	অসমিয়া	হিন্দি	অন্যান্য ভাষা
১৯১১	৪৫.৬	২১.৬	৬.১	২৬.৫
১৯৩১	২৬.৭	৩১.৪	৭.৬	৩৪.১৭
১৯৫১	১৬.৫	৫৬.৬	৩.৮	২২.৯৯
২০১১	২৮.৯১	৪৮.৩৮	৬.৩	১৬.৪০

আসাম ও বাংলা এক দেশ থাকাকালেই ভাষাকেন্দ্রিক বৈরিতা মাথাচাড়া দিচ্ছিল। অসমিয়াকে দাপ্তরিক ভাষা করার কয়েক মাস পরই তাই ১৮৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আসামকে 'চিফ কমিশনার'-এর অধীন পৃথক প্রদেশ ঘোষণা করা হয়।[৬] রাজধানী করা হয় শিলংকে। বৃহত্তর পূর্ব বাংলা থেকে পৃথক হয়ে যায় আসাম। যদিও সিলেট অঞ্চল সেখানেই থেকে যায়। ১৯০৫ পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে।

প্রশাসনিক এসব অদল-বদলের প্রক্রিয়ায় একটা বিষয় স্পষ্ট যে ঔপনিবেশিক আসাম ব্রিটিশদের অধীনে অন্যান্য ভারতীয় 'প্রদেশ'-এর মতো নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত বা সংস্কৃতিগতভাবে একক চরিত্রের কোনো জনপদ ছিল না। আসামের এই বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক চরিত্র আরও ব্যাপকতা পায়, যখন আসাম ও বাংলার মধ্যে রেলওয়ের সূচনা ঘটে। আসামের সঙ্গে বাংলার যৌথতা ও নিবিড়তার বড় উল্লম্ফন ছিল আসাম-বেঙ্গল রেল যোগাযোগ। চট্টগ্রামে এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ছিল। সেই দপ্তরই এখন চট্টগ্রামে 'সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং' বা সিআরবি নামে পরিচিত। ব্রিটিশরা বাংলা প্রেসিডেন্সির দুটি বন্দর কলকাতা ও চট্টগ্রামের মধ্যে শেষোক্তটিকে আসামের চা-বাণিজ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী ছিল। ১৮৯২ সালে শুরু হয়ে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে কাজ করে, যা একপর্যায়ে আজকের আসামের তিনসুকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর তিনটি অংশ ছিল।

প্রথম অংশ চট্টগ্রাম থেকে বরাক ভ্যালির বদরপুর পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশ বদরপুর থেকে কেন্দ্রীয় আসামের নগাঁওয়ের লুমদিং পর্যন্ত। তৃতীয় অংশ লুমদিং থেকে গুয়াহাটি এবং তিনসুকিয়া পর্যন্ত। বিভিন্ন শাখা লাইন মিলিয়ে ৫৭৪ মাইল দীর্ঘ এই রেলওয়ে ১৯০৩ সাল নাগাদ পুরোই কার্যকর হয়ে যায়। এর মধ্যে প্রথম অংশে গাড়ি চলা শুরু ১৮৯৬ সালে। (নিচের রুটম্যাপ দ্রষ্টব্য[৭]) এর চার বছরের মাথায় গুয়াহাটি এই যোগাযোগে যুক্ত হয়। গুয়াহাটির বাণিজ্যিক বিকাশের শুরু তখন থেকে। এরও বহু পরে গুয়াহাটি কলকাতামুখী ট্রেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল।

১৯৪২ সালে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের রুট 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে'র সঙ্গে যুক্ত হয়। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৫৭ থেকে গড়ে উঠেছিল কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ামুখী হয়ে। 'আসাম-বেঙ্গল' ও 'ইস্টার্ন বেঙ্গল' রেলওয়ের বিকাশ এবং বাংলার সঙ্গে আসামের স্টিমার সার্ভিস সংগত কারণেই আসামের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল এবং পূর্ব বাংলা থেকে বাংলাভাষীদের যাতায়াত ও প্রয়োজনে বসবাসকে উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু সংখ্যার হিসাবে সেটা যতটা প্রচারিত হয়—ততটা নয় মোটেই। ২০১৯ সালের আসামের এনআরসির চূড়ান্ত তালিকাই সেই সত্য জানাচ্ছে।

চিত্র : আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে

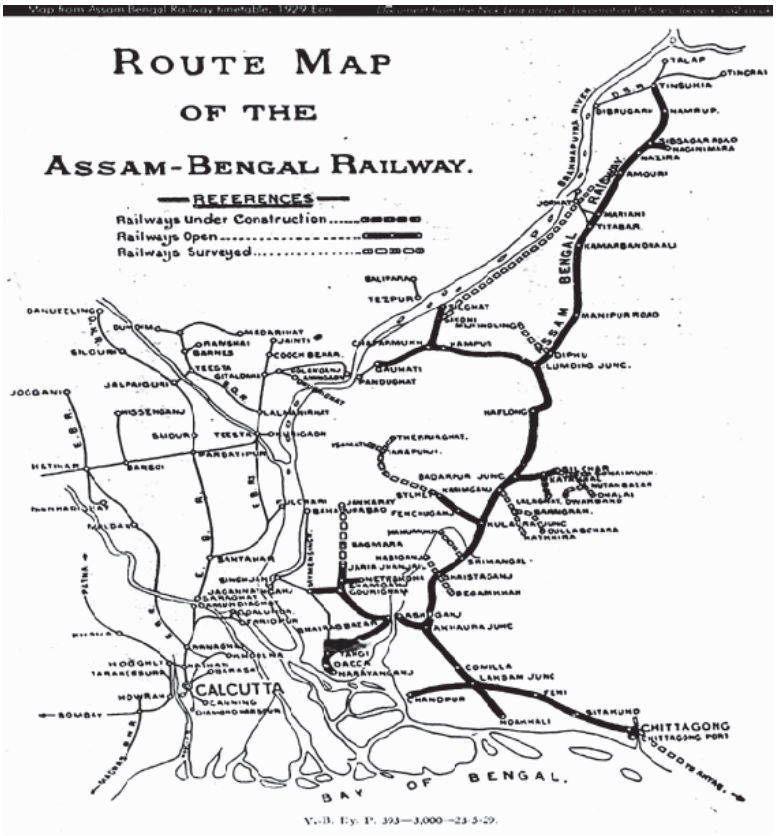

এটা সত্য যে ব্রিটিশ শাসক এবং আসামের প্রশাসকদের উৎসাহে কিছু কৃষিজীবী মানুষ আসামে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন ব্রিটিশ শক্তি পূর্ব বাংলা থেকে কৃষিজীবীদের আসামে নিতে চাইছিল, তার কারণও আসামের রাজনৈতিক সাহিত্যে সঠিকভাবে বর্ণিত হয় না। কেউ কেউ মৃদুভাবে বলেন বটে, খাদ্য ফলাতে এবং তা থেকে রাজস্ব আয় বাড়াতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা সে রকম নীতি নিয়েছিলেন। এটা আংশিক সত্যমাত্র। মূলত আসামে চা-শিল্প টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেও ওখানকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানো দরকার ছিল। কারণ, হঠাৎ করে আসামে লাখ লাখ চা-শ্রমিক নেওয়া হলেও তাঁদের খাবারের জোগান দেওয়া আসামের কৃষিসমাজের জন্য কঠিন ছিল।

সারণি : দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলা থেকে আসামে খাদ্য আমদানি বৃদ্ধির ধারা[৮]

(ইতিহাসের এই সময়টুকু আসাম ও বাংলা পৃথক প্রদেশরূপে ছিল)

[Source : Proceedings of the Chief Commissioner of Assam, Revenue & Agriculture Dept, 1898, Assam Secretariat Printing Office, Shillong, 1898]

বছর	পরিমাণ (মণ)	বছর	পরিমাণ (মণ)
১৮৭৬-৭৭	৪১১৪৩১	১৮৯৫-৯৬	৭১৪৭০৩
১৮৮১-৮২	৪৪২২১৯	১৮৯৬-৯৭	৯৬৩৯৪৭
১৮৮৫-৮৬	৪২১৪৩৭	১৮৯৭-৯৮	৬৯৪৭২৫

বাগানিয়া জনগোষ্ঠীতে শ্রমিক ছাড়াও ছিলেন উদ্যোক্তারা এবং কর্মকর্তা পর্যায়ের ব্যক্তিরা। এঁদের সবার জন্যই বিপুল খাদ্য প্রয়োজন ছিল। ফলে বাগিচাবাসীদের খাবার এবং চা খাতকে দীর্ঘ মেয়াদে টিকিয়ে রাখা ও লাভজনক রাখার জন্য ক্রমবর্ধমান খাদ্য আমদানির বিপরীতে বাগিচা অর্থনীতির প্রয়োজন ছিল টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা তথা সস্তায় সাধারণ খাবারের প্রতিবন্ধকতাহীন জোগান।

আসামে চাষের উপযোগী পর্যাপ্ত পতিত জমি থাকলেও পর্যাপ্ত কৃষিজ্ঞান, লোকবলের অভাবে চা-অর্থনীতির ওই চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছিল না। তখনই বিকল্প হিসেবে বাইরে থেকে কৃষিজীবীদের আসামে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এটা সরাসরি আসামের চাহিদা, আসামের অর্থনীতি এবং ব্রিটিশ পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল। পাশাপাশি লাখ লাখ একর পতিত জমি ব্রিটিশ শাসকদের কাছে ছিল রাজস্ব আয়ের সম্ভাব্য বিশাল উৎসও। এটা মোটেই পূর্ববঙ্গীয় বাংলাভাষীদের হঠাৎ স্বপ্রণোদিত আসামযাত্রার কোনো বিষয় ছিল না—যেমনটি আসামের রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা বলে চলেছেন বহুকাল যাবৎ এবং এখনও।

ঠিক উপরিউক্ত কারণেই ব্রিটিশ শাসকেরা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই আসামে যাতায়াত ও যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত ছিল—বিশেষ করে চা অর্থনীতির সূচনার পর। চা ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আসামের পাট এ সময় ব্রিটিশদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। আসামে পাট উৎপাদনও ছিল বাংলাভাষী চাষিদেরই অবদান। বস্তুত, ব্রিটিশ অধীনস্থ আসামে বাংলাভাষীদের অভিবাসনকে তখনকার অর্থনীতি ও যোগাযোগব্যবস্থার উপরিউক্ত উপাদান ও বিকাশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝার চেষ্টার কারণেই কার্যত তা ভুল উপসংহারে নিয়ে যায় অনুসন্ধানকারীদের।[৯]

১৯০৫ থেকে ১৯১২ : পূর্ব বাংলা ও আসামে রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতার যৌথ সূচনা

এটা সবারই জানা, ১৯০৫ সালে ব্রিটিশরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে আসাম ও বাংলার একাংশ নিয়ে 'পূর্ব বাংলা এবং আসাম' নামে পৃথক একটি প্রদেশ গঠন করে। প্রায় তিন দশক পর ইতিহাসে এভাবে দ্বিতীয়বার আসাম ও পূর্ব বাংলা প্রশাসনিকভাবে একত্র হয়। ত্রিপুরা ও কোচবিহার 'দেশীয় রাজ্য' হিসেবে সরাসরি গভর্নরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এ সময় পূর্ব বাংলা-আসাম প্রদেশটির আয়তন ছিল প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার বর্গমাইল। কক্সবাজার উপকূল থেকে ভুটানসংলগ্ন দররাং পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ছিল এই প্রদেশের বিস্তৃতি। ঢাকা ছিল প্রদেশের রাজধানী। তবে গ্রীষ্মকালে রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হতো শিলং। স্পষ্টত এই সময়ে আজকের আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও বাংলাদেশ (যশোর-খুলনা বাদে) একটা 'দেশ' ছিল। এর মধ্যেই ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক কিছু প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ছিল। মণিপুর ও কোচবিহার আলাদা প্রশাসনিক সত্তা হিসেবে থাকলেও যথাক্রমে আসাম ও রাজশাহী বিভাগ ছিল তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক। একটা আইনসভাও ছিল আসাম ও পূর্ব বাংলা প্রদেশের, যার দাপ্তরিক নাম ছিল Legislative Council of Eastern Bengal and Assam। অর্থাৎ আসামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার সূচনা হয়েছিল পূর্ব বাংলার সঙ্গে মিলেই। যদিও প্রদেশ পরিচালনাকারী ঔপনিবেশিক নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রাথমিক এই প্রাদেশিক সভার সদস্যদের (যাঁরা মূলত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুপারিশকৃত হয়ে আসতেন) মতামতের মূল্য ছিল সামান্য—কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্বের সংস্কৃতির এটা ছিল শুরুর বিন্দু। ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই পরিষদের অধিবেশন বসে ঢাকায়। প্রথমে এর সদস্যসংখ্যা ছিল ২৫ এবং তাতে আসামের প্রতিনিধি ছিলেন চারজন। এই চারজনের একজন ছিলেন চা-বাগানমালিকদের মধ্য থেকে ইউরোপীয়। পরে পরিষদের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে। আসামের প্রতিনিধিত্বও বেড়েছে।

এইরূপ সম্মিলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং ওপরে আলোচিত যোগাযোগব্যবস্থার পটভূমিতে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলা ও (আজকের ভারতের) সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মানুষের মধ্যে যাতায়াত ছিল। বিশেষত এ সময় আসামে রাজস্ব আয় বাড়াতে ব্রিটিশ শক্তি ক্রমে বেশি বেশি এলাকাকে চাষাবাদের অধীনে আনার উদ্যোগ নিচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় অহমিয়াদের চেয়ে 'অধিকতর কৃষি উদ্যোক্তা' মনোভাবের কারণে পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষীরা তাদের বিশেষ পছন্দ ছিল।

ইতিহাসের এই সময়েই (১৯০৪) আসামে গিয়েছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ভাসানীর এই আসাম যাত্রা ছিল পূর্ববঙ্গীয় দরিদ্র কৃষকদের একাংশের আসামযাত্রারই অংশ। তবে পরিস্থিতির চাপে ভাসানী আসামে অভূতপূর্ব

এক কৃষক সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন সে সময়, যা শেষ পর্যন্ত আসামে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁকে আসামে মুসলিম লীগের সভাপতিতে পরিণত করে। আসামে শ্রেণি রাজনীতি ও জাতিবাদী রাজনীতির একরকম শুরুর বিন্দুও এটা।

আসামে পূর্ববঙ্গের চাষি সমাজের এক 'মাওলানা'

ভাসানী আসাম যাওয়ার আগেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে অনেক দরিদ্র কৃষক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এর অন্তত তিনটি কারণ ছিল। প্রথম কারণটির কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলের দীর্ঘ সময় আসাম ও পূর্ব বাংলা একই দেশ ছিল এবং রেল, স্টিমার, ডাক যোগাযোগসহ সামগ্রিক যোগাযোগব্যবস্থাই গড়ে উঠছিল আসাম ও পূর্ব বাংলাকে যুক্ত করে একক প্রদেশ আকারে। পাশাপাশি আসামে ছিল নির্বিঘ্নে কৃষি আবাদের জন্য বাড়তি জমি। ফলে কিছু কিছু দরিদ্র চাষি আসামমুখী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসকেরা রাজস্ব আয় বাড়াতে এবং খাদ্যের জোগান বাড়াতে আসামে নতুন আবাদে উৎসাহমূলক ভূমিকা নিয়েছিল। তৃতীয়ত, পূর্ববঙ্গে মুসলমান চাষিদের ওপর জমিদার ও মহাজনদের নিপীড়ন তীব্রতা পাওয়ায় প্রথমোক্তরা ঝুঁকি নিয়ে হলেও আসামে যেতে প্রস্তুত ছিল। মাওলানা ভাসানীর আসাম চলে যাওয়ার পেছনেও পূর্ববঙ্গীয় জমিদারদের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

আসামে পূর্ববঙ্গীয় এই কৃষকদের প্রধান গন্তব্য ছিল ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি। মাওলানাও প্রথম সেখানেই যান। তবে সেখানে যে এ ধরনের মানুষেরা যাওয়ার পরই বাংলাভাষীদের সংখ্যা বেড়েছে, তা নয়। ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির পূর্ব বাংলাসংলগ্ন অঞ্চলে আগে থেকেই বাংলাভাষীদের আধিক্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলা থেকে সেখানে যে রকম ব্যাপকহারে জনগোষ্ঠী যাওয়ার কথা বলা হয়, সেটা যে প্রশ্নবিদ্ধ, তার সাক্ষ্য মেলে ব্রিটিশদের প্রণীত ১৯০১ সালের শুমারি দলিল থেকে। যেমন সেখানে মুসলমানপ্রধান গোয়ালপাড়া সম্পর্কে বর্ণিত হচ্ছে:

> The population of Goalpara increased by 2 percent during the decade, the whole of the increase being due to natural growth, as there was a slight falling off in the number of immigrants from Bengal. The district is a purely agricultural one, there is nothing to attract immigrants, and as the public health has not been particularly good, the rate of increase has been slow, the population of the district having only increased by 15,352 souls during the last twenty years. There is nothing, however, very remarkable in this fact, as between 1881 and 1891 the neighbouring district of Rangpur decreased by 1.6 per cent; and in this

portion of province it would seem that the condition of life are normally unfavourable to a rapid growth of the population.[১০]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গোয়ালপাড়া জেলার তখনকার ৪ লাখ ৬২ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ৩ লাখ ২০ হাজারই ছিলেন বাংলাভাষী। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বাসিন্দাদের কাছে আসামের এই অঞ্চল তখন ভাষাগত বিবেচনায় কোনো 'বিদেশ' ছিল না। উপরন্তু আসামের ভূস্বামীরা পূর্ববঙ্গীয় চাষিদের এখানে স্বাগত জানাতেন।[১১] কিন্তু সামগ্রিক অন্যান্য বসতিসুবিধার অপ্রতুলতায় তাঁদের ব্যাপক অভিগমন সম্ভব ছিল না।[১২]

ইতিহাসের এই সময়ে ১৯০৪ সালে মাওলানা ভাসানী প্রথম আসামের জলেশ্বর যান আধ্যাত্মিক সাধক সৈয়দ নাসিরউদ্দিন বোগদাদির মুরিদ হয়ে।[১৩] এরপর আবার তিনি আসামের বাইরে ছিলেন অনেক বছর। ১৯০৯ সালে তিনি আবার আসাম আসেন। বাংলায় তখন ব্যাপকভাবে 'বঙ্গভঙ্গ'-বিরোধী আন্দোলন চলছিল।

মাওলানা ভাসানীর আসাম যাওয়া-আসার প্রাথমিক দিনগুলোতেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের চাপে ১৯১২ সালে বাংলা আবার পুনরেকত্রীকরণ হয় এবং আসামকে তার থেকে পৃথক করা হয়। বাংলা থেকে বিহার ও উড়িষ্যাকেও বিচ্ছিন্ন করা হয়। ভারত সরকারের সদর দপ্তরও কলকাতা থেকে প্রত্যাহার হয়। সিলেটকে জুড়ে দেওয়া হয় আসামের সঙ্গে এবং আসামকে আবার 'চিফ কমিশনার'-এর অধীনস্থ প্রদেশ করা হয়।[১৪] শাসকদের এ রকম প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলার যোগাযোগ কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে যাঁরা আসাম থেকে বাংলায় কিংবা বাংলা থেকে আসামে গিয়ে আয়-রোজগারের কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে আবার পূর্বতন জায়গায় ফেরত যাননি। ভাসানীকেও এ রকম শেষোক্ত দলে ফেলা যায়।

১৯১৯ থেকে আসামে প্রায় সার্বক্ষণিক কৃষক রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন ভাসানী। ১৯২৪ সালে তিনি ধুবড়ির ভাসানচরে বড় কৃষক সম্মেলন করেন। সেই থেকেই তিনি 'ভাসানচরের মাওলানা' তথা 'মাওলানা ভাসানী' হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ থেকে ধুবড়ির ঘাগমারায় বসবাসও শুরু করেন তিনি। পরবর্তীকালে ক্রমে তিনি আসামের বাঙালি কৃষিজীবীদের বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে যান। 'আসাম চাষী মজুর সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে তাঁর নেতৃত্বে। কৃষিজীবীদের কোণঠাসা করতে আসামে যে 'লাইন প্রথা' জারি হয়, তার বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিলেন মাওলানা। তবে তাঁর কার্যক্রম কেবল লাইন প্রথাকে ঘিরে আবর্তিত ছিল না। সে সময় আসামে বাটখারাকেন্দ্রিক জটিলতায় ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে দরিদ্র খুদে উৎপাদকেরা বড় ব্যবসায়ীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। ভাসানী এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেখানে একক পদ্ধতির মাপের প্রচলন করান, যা

আসামের ইতিহাসে 'ওজন আন্দোলন' নামে পরিচিত।

এসবেরই মিলিত ফল হিসেবে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি দক্ষিণ ধুবড়ি থেকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় ভাসানীই একমাত্র বাংলায় বক্তৃতা করতেন বলে জানা যায়।[১৫] ফলে আসামে বহু আগে থেকে বসবাসকারী বাংলাভাষীদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী মনোবলের জাগরণ ঘটার সাহস তৈরি হয়। প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন ছাড়াও ভাসানচরের এই মাওলানার পরবর্তী এক দশকের ভূমিকাকে তুলনা করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভূমিকার সঙ্গে। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা-যাত্রার এক দশক পর আবদুল হামিদ খান আসাম যান। তবে ইতিহাসের এটা বড় এক বৈপরীত্য বটে—সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া আফ্রিকায় গান্ধীর ভূমিকাকে যখন গভীর শ্রদ্ধা ও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করে—তখন আসামে মাওলানা ভাসানীর ক্ষেত্রে একই অঞ্চলের বুদ্ধিজীবিতার মধ্যে সে রকম মনোভাব প্রায় অনুপস্থিত।[১৬] বরং তাঁকে উপস্থাপন করা হয় সাম্প্রদায়িক চরিত্র আকারে। অথচ গান্ধীর মতোই ভাসানীও নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় একই রকম ভূমিকাই রেখেছিলেন। ভাসানীর আসাম অধ্যায় নিয়ে তেমন গবেষণা না হওয়ার কারণগুলো অনুসন্ধান করা দরকার।

১৯১২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার সঙ্গে আসামের সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায়ে অনুসন্ধান চালালে আমরা দেখব ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির সংগ্রাম ও সম্ভাবনা। এ সময়ে আসামের রাজনীতিতে বাংলাভাষীরা নেতৃত্বদায়ী অবস্থানে চলে গিয়েছিল এবং মুসলমানরাও তাতে শরিক ছিল। তবে ইতিহাসের ঠিক এই সময়েই ধীরে ধীরে আসামে বাংলাভাষী—বিশেষত বাংলাভাষী মুসলমানদের দরিদ্র অংশের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আক্রমণ শুরু, যার শেষ অধ্যায়ের উত্থান গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে এবং যার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ২০১৮-১৯-এ আসামের এনআরসি প্রক্রিয়ায়। ক্রমবিকাশমান বর্ণবাদ, তার জের হিসেবে ১৯ লাখ ৬ হাজার মানুষকে আপাতত রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করলেও আসামে পরিচয়ের রাজনীতি শিগগির থামবে না।

লাইন প্রথার স্মৃতি : স্কুল থেকে উচ্ছেদ শুরু হলো বাংলা

আসামসহ সমগ্র ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বের প্রধান ঘটনা ছিল ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন। তার আগে আসামে ১৯২৩ সালের নির্বাচন শেষে স্বরাজ দল 'স্বতন্ত্র'দের নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদে 'ন্যাশনালিস্ট জোট' নামের একটা মোর্চা গড়তে সমর্থ হয়েছিল। ১৯২৯ পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদে স্বরাজিদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকে, যার অন্যতম নেতা ছিলেন ফয়েজনুর আলী। এ সময়

আসাম প্রাদেশিক সভায় মুসলমানরা তাদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও পায়। ফলে কোনোভাবেই তখন দৃশ্যপটটি এমন ছিল না যে বাংলাভাষী মুসলমানরা আসামে 'বিদেশি'।

যদিও মুসলমানদের একাংশ—যারা মূলত দরিদ্র এবং সরকারের উৎসাহে আসামের পতিত জমিতে চাষাবাদের সূত্রে সেখানে গিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে তখন ধীরে ধীরে আন্দোলনের আওয়াজ তুলছিল অসমিয়াভাষীদের একটা গোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর নেতৃত্বে ছিলেন অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী (১৮৮৫-১৯৬৭)। কংগ্রেস রাজনীতিতে সুবিধা করতে পারেননি, এমন অনেকেও বিকল্প পথ হিসেবে এ সময় অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীর 'আসাম সংরক্ষণী সভা'-তে যোগ দিতে শুরু করেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি ও রাজনীতিবিদ নীলমণি পুকন (১৮৮০-১৯৭৮)। বাংলাভাষী চাষিদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে 'আসামি জাতিসত্তা হুমকির মুখে এবং তাকে বাঁচাতে হবে'—এটাই ছিল আসাম সংরক্ষণী সভার রাজনীতি। ১৯২৬ সালে শুরু হয়েছিল সংরক্ষণী সভার কার্যক্রমের। তাদেরই আন্দোলনের বহুল আলোচিত ফসল ছিল ১৯২০-এর দশকে বিভিন্ন জেলায় কুখ্যাত 'লাইন প্রথা'[১৭] বাস্তবায়ন এবং তারপর ১৯৩৫ সালে স্কুলগুলো থেকে বাংলা ভাষার উচ্ছেদ।

আসামে এ সময় রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সংগঠিত ছিল কংগ্রেস অনুসারীরা। ১৯২১ সালের আগস্টে গান্ধীর আসাম আগমনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা বেশ অনুপ্রাণিত হন। কিন্তু এ সময়ের চারটি বড় প্রবণতাও ছিল—কংগ্রেস মুসলমান সংগঠকদের সবাইকে সঙ্গে নিতে পারছিল না, দলটিতে স্বরাজিদের উপদলটিই[১৮] ছিল শক্তিশালী, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল—যা আসামের নেতৃত্বের একাংশ পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে অপারগতা দেখাচ্ছিল, অসমিয়াদের একাংশের উদীয়মান বাঙালি বিরোধিতাও কংগ্রেসের জন্য বিব্রতকর ছিল এবং অসমিয়া অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র ও বাঙালি অধ্যুষিত সুরমা ভ্যালি আসামের রাজনীতির দুটি পৃথক কেন্দ্র হয়ে উঠছিল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসামে প্রথমবারের মতো পূর্ণ নির্বাচিত একটি প্রাদেশিক সভা গড়ে ওঠে।[১৯] এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল ১০৮। পরিষদের সভা বসত শিলংয়ে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে এ রকম প্রথম সভা বসে। বহু পরে, কেবল ১৯৭৩ সালে আসাম প্রাদেশিক সভা শিলং থেকে গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৩৭ সালে নির্বাচিত আসাম প্রাদেশিক পরিষদে ১০৮ জন সদস্যের মধ্যে ৩৪ জন ছিলেন মুসলমান। যদিও এই আসনগুলো মুসলমানদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল—কিন্তু সংখ্যার এই বিপুলতা থেকে তখনকার আসামে মুসলমান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রভাবের সাক্ষ্য মেলে। পরিষদে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১ শতাংশ)

সদস্যই ছিলেন মুসলমান।[২০] তবে তাঁরা বিভক্ত ছিলেন বহু দলে। কংগ্রেসেও এই সম্প্রদায়ের অনেক নেতা ছিলেন। তখনো আসামে মুসলিম লীগ ছিল অতি দুর্বল এবং অতি অসংগঠিত। যদিও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়, আসামে মুসলমানরা পৃথক এক রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজছে। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য, একই নির্বাচনে বাংলায়ও কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির পরই কেবল মুসলিম লীগের অবস্থান ছিল। ২৫০ আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ৫৪ আসনের বিপরীতে কৃষক প্রজা পার্টি সেখানে ৪০ এবং মুসলিম লীগ ৩৯ আসন পেয়েছিল। আসামের মতোই বাংলায় মুসলমান ভোট বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট কংগ্রেস একচেটিয়াভাবেই পেয়েছিল। বস্তুত, এই অঞ্চলে '১৯৪০ পর্যন্ত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক চিন্তায় মুসলমানরা তখনো ঐক্যবদ্ধ হননি।'[২১]

বাংলার মতোই আসামেও এই নির্বাচন-পরবর্তী সরকারও গঠিত হয় পরিষদের একজন মুসলিম সদস্যের নেতৃত্বে (সৈয়দ সা'দুল্লাহ)।[২২] এই নির্বাচনে এককভাবে দল হিসেবে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি আসন (১০৮-এর মধ্যে ৩৩) পেলেও সা'দুল্লাহ সরকার গড়তে সমর্থ হয়েছিলেন মুসলমান সদস্যদের প্রতি 'ট্রাইবাল' জনপ্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থনের কারণে।[২৩] নির্বাচনে সা'দুল্লাহর দল আসাম ভ্যালি মুসলমান গ্রুপ মাত্র পাঁচটি আসন পায়। তবে তাঁর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং বিভিন্ন দলের হলেও সমগ্র পরিষদের মুসলমান সদস্যদের বিপুল সংখ্যা এই সরকারের শক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আসামে মুসলমানদের মধ্যে বরাবরই পৃথক দুটি পরিচয়গত ধারা ছিল। একদল নিজেদের পুরোনো বাসিন্দা হিসেবে দেখতেন, অসমিয়া জানতেন, আর্থিকভাবেও ছিলেন সবল। অন্য ধারা ছিল চাষি সমাজ, যারা ছিল বাংলাভাষী, যাদের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুদের আন্দোলনে আদি মুসলমানদের দৌদুল্যমান দেখা যেত। আসামের রাজনীতিবিদ ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ, সা'দুল্লাহ প্রমুখ শেষোক্তদেরই প্রতিনিধি ছিলেন। তবে সরকার গঠনের সুযোগ পেয়ে তাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে দ্রুতই সৈয়দ সা'দুল্লাহ মুসলিম লীগে যোগ দেন। তবে লাইন প্রথা বাতিল করতে ছিলেন ইতস্তত। তিনি লাইন প্রথা পরিপূর্ণভাবে বাতিলের পক্ষে ছিলেন না। এ প্রশ্নে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সৈয়দ সা'দুল্লাহদের ভিন্ন অবস্থান ছিল। তাঁরা উভয়েই ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

তবে অভিজাত এবং ধনী নেতৃত্বের মুসলিম লীগে ভিন্ন একটি ধারা গড়তে সচেষ্ট ছিলেন ভাসানী, যার বড় এক প্রকাশ ছিল সেখানে 'চাষী মজদুর সমিতি' গঠন। আসামের মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে এই সামাজিক দ্বিধাবিভক্তি ১৯৪৬ সাল নাগাদ বিধ্বংসী এক রাজনৈতিক রূপ নেয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগ অতি দুর্বল অবস্থায় ছিল। আসামে মুসলিম লীগের জন্ম সিলেট অঞ্চলে—আবদুল মতিন চৌধুরী প্রমুখের মাধ্যমে। তবে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন এই দলকে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির মুসলমানদের কাছেও পরিচিতি এনে দেয়। আসামের রাজনীতির তিনটি ভরকেন্দ্র ছিল ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি, সুরমা ভ্যালি ও শিলং। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির মুসলমান চাষি সমাজও মুসলিম লীগের সমর্থক হয়ে উঠতে শুরু করে। ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির[২৪] আওয়াজ দেওয়ামাত্র আসামের বাংলাভাষী মুসলমান চাষি সমাজের মধ্যে দলের সমর্থক পরিসর বাড়তে থাকে। এই চাষি সমাজ অসমিয়াদের বর্ণবাদী আচরণে সৃষ্ট হতাশা থেকে এ রকম রাজনৈতিক অবস্থান নিতে বাধ্য হচ্ছিল। মাওলানা ভাসানী এদের মূল নেতা ছিলেন। ফলে দ্রুত তিনি মুসলিম লীগের জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হন। মাঠের পরিস্থিতির কারণে প্রাদেশিক পরিষদের অনেক স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যও তখন মুসলিম লীগে যুক্ত হতে থাকেন।

তবে এ সময় (১৯৪২-৪৩) মুসলমান চাষি সমাজের স্বার্থে ভাসানীর আগ্রাসী ভূমিকা এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন'-কে এক করে ফেলার মাধ্যমে আসামে হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোকে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল বলেও ঐতিহাসিকভাবে প্রতীয়মান হয়। এ সময় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব বলতে শুরু করে, লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলন আসলে আসামকে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টামাত্র। তাদের এই বক্তব্যের পক্ষে বড় প্রমাণ ছিল ভাসানীর মুসলিম লীগ সভাপতি হিসেবে থাকা। এভাবে লাইন প্রথাও ক্রমে এক সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে, যখন আসামের বর্ণহিন্দুরা এর পক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করে। অথচ এই প্রথার দ্বারা সংখ্যায় অল্প হলেও অনেক হিন্দু চাষিও ক্ষতিগ্রস্ত ছিলেন।[২৫]

লাইন প্রথা বাতিল না করায় সা'দুল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বলছিলেন ভাসানী। ফলে লাইন প্রথা নিয়ে মুসলিম লীগের মধ্যেও সভাপতি বনাম প্রধানমন্ত্রী দ্বন্দ্বাত্মক অবস্থা তৈরি হয়। সা'দুল্লাহ সরকারের টিকে থাকা কেবল লাইন প্রথাবিরোধী এমএলএদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। এই সরকার গঠন সম্ভব হয়েছিল তফসিলি ও ট্রাইবাল সদস্যদের সমর্থনের মাধ্যমেও। ফলে সৈয়দ সা'দুল্লাহকে তাঁদের মতামতও শুনতে হচ্ছিল। এভাবেই মুসলমান সমাজের দ্রুত বর্ধনশীল রাজনৈতিক দল আসাম মুসলিম লীগে ভাসানী বনাম সা'দুল্লাহ আন্তদলীয় কোন্দল প্রবল হয়ে ওঠে। এই কোন্দলের একটা শ্রেণিগত দিকও ছিল। দলটিতে আরও অনেক উপদলও ছিল। ফল হিসেবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এই দল

সামর্থ্য অনুযায়ী একক অবস্থান নিতে পারেনি। নির্বাচনের পরই সরকার গঠন করে কংগ্রেস।

এরপর কলকাতায় দেখা দেয় দাঙ্গা। তার ছাপ পড়ে আসামেও। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মেরুকরণ চূড়ান্ত রূপ পেতে শুরু করে ভারতব্যাপী। ১৯৪৭ সালের মার্চে আসামে কংগ্রেসের বরদৈল সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হলেন ভাসানী। আসামের বাঙালি চাষি সমাজ দীর্ঘ সময়ের জন্য নেতৃত্বহীন হয়ে গেল।[২৬] তারই দীর্ঘ এক জের আজকের বিপুলসংখ্যক মুসলমানকে লক্ষ্যবস্তু করে এনআরসির মাধ্যমে জাতীয়তা বাতিল করার চেষ্টা। তবে এখন পর্যন্ত এনআরসির মাধ্যমে তাদের জাতীয়তা হারানোর শিকার হয়েছে বেশির ভাগ হিন্দুধর্মাবলম্বী। কিন্তু কার্যত এনআরসির ধারণা আসে বাঙালি মুসলমানদের লক্ষ্য করে। জাতিঘৃণা ও সাম্প্রদায়িকতার এক করুণ পরিণতি এটা।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন : আসামে মুসলমানসত্তার আত্মবিনাশী বিভক্তি

আজকের আসামে সাধারণভাবে বাংলাদেশি এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের নির্যাতিত বাস্তবতার প্রধান এক কারণ হিসেবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকালীন ঘটনাবলিকে চিহ্নিত করা যায়। ভারতের অন্যান্য অংশের মতোই এই নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতার লক্ষ্যে ভোট চাইছিল।

অন্যদিকে, কংগ্রেস লক্ষ্য নিয়েছিল যেভাবেই হোক এটা দেখানো যে মুসলিম লীগ আসামের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি নয় এবং আসামের মুসলমানরা অনেকেই তাদের সমর্থকও বটে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে তারা দুটো কৌশল নেয়। প্রথমত, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাখা হয় দুজন মুসলমান—তৈয়্যবুল্লাহ ও ফখরুদ্দীন আলী আহমদকে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত আসনগুলোতে লড়তে 'জামায়াতে উলেমা হিন্দ'-কে কাছে টেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি আসনে কংগ্রেস-জামায়াত জোট মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়। এদের মদদ দিতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে নেহরু আসাম আসেন। সিলেটও বাদ যায়নি তাঁর জনসভার তালিকা থেকে। আসেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবীরও।

তবে মুসলিম ভোট দ্বিধাবিভক্ত করতে কংগ্রেসের প্রধান অস্ত্র ছিল জামায়াতের মাওলানা মাদানী। কেবল সিলেটেই মাদানী নির্বাচনকালে আটটি সভা করেন। এভাবে সমগ্র আসামের মুসলমানরা আসন্ন স্বাধীনতার ধরন প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেওবন্দ ঘরানার আলেম হিসেবে মাদানীর বিশেষ প্রভাব ছিল বাংলাভাষী আলেম-ওলামাদের মধ্যে।

সারণি : তিন

আসামে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৪৬ (যখন মোট আসন ১০৮)

দল	প্রাপ্ত আসন
কংগ্রেস	৫৮
মুসলিম লীগ	৩১
জামায়াতে হিন্দ-কংগ্রেস জোট (মুসলমান আসনে)	৩
ইউরোপিয়ান প্রতিনিধি (মূলত চা-বাগিচামালিকেরা)	৯
অন্যান্য	৭

নির্বাচনে যদিও কংগ্রেস-জামায়াত জোট প্রত্যাশিতভাবে সফল হয়নি, ফখরুদ্দীন আলী আহমদের মতো প্রধান নেতাও পরাজিত হয়েছিলেন; হিন্দু মহাসভা খুব খারাপ ফল করে—তবে এই নির্বাচনে আসামজুড়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্বে কংগ্রেস দীর্ঘস্থায়ী এক ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। আসামে মুসলমানদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি বনাম বরাক ভ্যালি এবং আসামি মুসলমান বনাম বাংলাভাষী মুসলমান ইত্যাদি যেসব বিভাজন ছিল, সেগুলো মুসলিম লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে ছাপিয়ে বড় হয়ে যায়। তার সঙ্গে নতুন উপসর্গ হিসেবে যোগ হয় জামায়াত বনাম মুসলিম লীগ দ্বন্দ্ব। মুসলমান স্বার্থের দিক থেকে সবচেয়ে বিধ্বংসী ফল বয়ে আনে হাইলাকান্দিতে মৌলভি আবদুল মাত্তালিব মজুমদার, সুরমা ভ্যালিতে আবদুর রশীদ চৌধুরী, মাওলানা ইব্রাহিম আলী প্রমুখ জামায়াত নেতার বিজয়। কারণ, তাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের অবস্থান সমর্থন করছিলেন। অথচ এসব এলাকায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। নির্বাচনের এ রকম ফল ১৯৪৭ সাল নাগাদ আসামের মুসলমানদের ভৌগোলিকভাবেও বিভক্ত করে ফেলে।

এই সময়ে ১৯৪৬ সালের মে মাসে ব্রিটিশরা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় প্রদেশগুলোকে তিনটি ক্যাটাগরিতে (এ, বি ও সি) ভাগ করার প্রস্তাব পেশ করেছিল, যাতে প্রতিরক্ষা ও আরও কিছু দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে রেখে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোকে একটা গুচ্ছ, মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলো দ্বিতীয় গুচ্ছ এবং হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান রয়েছে—এমন প্রদেশ (আসাম ও বাংলা) নিয়ে আরেকটি অঞ্চল গঠনের ধারণা ছিল। এই প্রস্তাব জিন্নাহ সমর্থন করেছিলেন। কংগ্রেসও প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবটি সমর্থন করে। এটা ছিল বাংলা ও আসামকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ রাখার ঐতিহাসিক শেষ সুযোগ। আসামে সৈয়দ সা'দুল্লাহ ও মাওলানা ভাসানীও এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আসাম প্রদেশ কংগ্রেস এই প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং রাজ্যজুড়ে

আন্দোলন শুরু করে। বাংলার সঙ্গে মিলে রাষ্ট্র হলে 'আসামের স্বার্বভৌমত্ব হারিয়ে যাবে'—এ ধরনের যুক্তি তোলেন আসাম কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা গোপীনাথ বরদৈল। তবে এই আন্দোলন চালানো হচ্ছিল ফখরুদ্দীন আহমেদ ও তৈয়্যবুল্লাহকে সামনে রেখে। তাঁরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছেও এ বিষয়ে তদবির শুরু করেন এবং গান্ধীর সমর্থন লাভে সমর্থ হন। গান্ধী তাঁদের বলেন,

> I have already told Assam not to go to the group, Assam will die, Congress behimd Assam Solidly. Congress is at yours back. Even if Congress fails to support you eventually, come out of the Congress Do Satyagraha against Congress.[২৭]

গান্ধীর এই অবস্থানের পরবর্তী অধ্যায় কল্পনা করে নেওয়া কঠিন নয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্রমে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরতে শুরু করে। এভাবেই আসাম ও বাংলার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভিন্ন উচ্চতায় স্থাপনের সুযোগটি হারিয়ে যায়। আর ভারতভুক্ত হয়ে আসাম সেদিন তার স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করে! তবে পরবর্তীকালে উলফাসহ অন্যান্য অসমিয়া সংগঠনের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন বরদৈলদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সেই কৌশলের যথার্থতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

কংগ্রেসের প্রায় একই মনোভাবের কারণে ১৯৪৭ সালে আসামের পাশাপাশি বাংলাও বিভক্ত হয়। পূর্ব বাংলা সমগ্র আসাম থেকে সিলেটের একাংশ মাত্র পায় গণভোটের মাধ্যমে। বাকি আসামের সঙ্গে থেকে যেতে হয় সিলেটের বিরাট অংশ—করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিকে। আসাম প্রাদেশিক পরিষদের আসনসংখ্যা এ সময় ১০৮ থেকে নেমে আসে ৭১-এ। সেখানে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসের মধ্যকার অসমিয়াভাষী উগ্রপন্থীরা এবং 'আসাম সংরক্ষণী সভা' বরাবরই মনে করত, সিলেটকে আসাম থেকে বাদ দিতে হবে। ১৯৩৭ থেকে পরবর্তী এক দশকে জনন্নাত ভোরা, নীলমণি পুখন প্রমুখ প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদেরা প্রচুর লিখেছেন এ বিষয়ে। ১৯৩৭ সালের ২৮ নভেম্বর কামরূপের রাঙ্গিয়ায় এলে নেহরুকে এ মর্মে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল।[২৮] ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির অসমিয়া জাতীয়তাবাদীদের একাংশ মনে করত, একমাত্র সিলেটকে বাদ দিয়েই আসামের রাজনীতিতে তাদের চিরস্থায়ী আধিপত্য কায়েম হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কার্যত তা-ই হয় ভারত ভাগকালে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস থেকে তাদের প্রধান দুই মুসলমান নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমেদ ও তৈয়্যবুল্লাহ প্রাদেশিক সভায় অনুপস্থিত থাকায় কংগ্রেসে মুসলমানবিরোধী অসমিয়া জাতীয়তাবাদীদের উত্থান সহজ হয়। কেবল কংগ্রেসই নয়, স্থানীয় অন্যান্য প্রধান

দলেও তারাই একচ্ছত্র ক্ষমতা পায় এবং রাজ্যজুড়ে বহু বছরের জন্য তাদের একচেটিয়াত্ব কায়েম হয়। এ রকম বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন কংগ্রেসের গোপীনাথ বরদৈল ও কংগ্রেস-বহির্ভূত রোহিনী কুমার চৌধুরীর মতো রাজনীতিবিদেরা। বরদৈল ১৯৩৭ সাল-পরবর্তী সা'দুল্লাহ সরকারের প্রধান বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনামলে আসামে পুনর্বাসিত বাংলাভাষী চাষি-সমাজের প্রতি কঠোর নীতির পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি ভারতের কেন্দ্র থেকে বিশেষভাবে গান্ধীর মদদ পাচ্ছিলেন, যা আসাম সংরক্ষণী সভার মতো কট্টরপন্থী সংগঠনগুলোর জন্য এক সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করে। ঠিক এ রকম পরিস্থিতিতেই মাওলানা ভাসানীও পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির বাংলাভাষী চাষি-সমাজ রাজনৈতিকভাবে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে এবং ক্রমে জাতিগত বিদ্বেষের মুখে পড়তে শুরু করে, যার এক ধরনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে ২০১৯ সালে।

আসামের সঙ্গে বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোর ১৯৪৭-পূর্ব সময়ে ১৮০ থেকে ১৯০ বছরজুড়ে ভাঙাগড়ার যে অতিসংক্ষিপ্ত ইতিহাস ওপরে তুলে ধরা হলো, তাতে স্পষ্টভাবেই সাক্ষ্য মেলে, আসাম শুধু অসমিয়াদের নয়—তা বাঙালিদেরও। তবে আসাম ও বাংলার প্রশাসনিক সম্পর্কের ভাঙাগড়ার বিভিন্ন পর্যায়ে নিশ্চিতভাবেই উভয় অঞ্চলের মধ্যে কিছু অভিবাসনও হয়েছে। তার ব্যাপক অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক কারণ রয়েছে। কোম্পানি শাসনে এবং সরাসরি ব্রিটিশ শাসনকালে কর আদায় বাড়াতে এবং কিছু কিছু খাতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের স্বার্থে আসামে মানুষের আগমন উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সেখানে 'শ্রমিক' ও 'উৎপাদক' মানুষকে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ড. অমলেন্দু গুহ লিখেছেন: 'শ্রমজীবী মজুরের সংকট থাকায় অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকেই বিপুল অনাবাদি জমির আসামে অভিবাসনকে স্বাগত জানানো হতো।'[২৯]

বিশেষত ১৯৪২ থেকে কয়েক বছর 'অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচি'র অধীনে বাঙালি চাষিদের আসামে আবাদে উৎসাহিত করা হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। এটা ঘটেছিল সৈয়দ সা'দুল্লাহ সরকারের চতুর্থ মেয়াদকালে (২৫ আগস্ট ১৯৪২-২৩ মার্চ ১৯৪৫)। এ সময় বাংলায় দুর্ভিক্ষাবস্থা থাকলেও আসাম তার ওই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়িয়ে যায় বাংলাভাষী চাষিদের মাধ্যমে। প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বিঘা জমি বরাদ্দের মধ্য দিয়ে এ সময় নগাঁও, দরং, কামরূপে মুসলমান আবাদিদের আগমনকে উৎসাহিত করা হয়।[৩০] আবার ঔপনিবেশিক শাসকদেরই বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় ১৯৪৭ সালের গণভোটের পর সিলেটের কিছু মানুষ যেমন আসামে চলে গেছেন, তেমনি বরাক ভ্যালি থেকেও অনেকে সিলেট চলে এসেছেন।

এর মধ্যে আসামজুড়ে বাংলাভাষীদের মধ্যে 'বাঙালি জাতীয়তাবোধ'-এর যতটুকু বিকাশ ঘটে, তাতে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিদের তুলনায় নবাগত মুসলমান চাষি-সমাজের হিস্যা ছিল সামান্য। যেহেতু ১৯৪৭-পূর্ববর্তী স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় মুসলমান নিম্নবর্গ চাইছিল আসাম পাকিস্তানের সঙ্গে গেলে ভালো হয়—সে কারণে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির এই নবাগত দরিদ্র মুসলমানরা স্থানীয় অসমিয়াদের চোখে চিরস্থায়ী এক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী হিরেণ গোহাঞি'র ভাষায়,

> Bengali Muslim peasants remained largely outside the process of the development of Bengali national consciousness and, from the 1920s to the 1940s, got drawn into the mass assertion of a separate Muslim identity and demanded the merger of Assam with the proposed state of Pakistan. While driven by desperately poor landless peasants' desire for land, this call for Pakistan greatly alarmed the natives of different communities. Suspicions against immigrant Muslims lingered long afterwards, even triggering sporadic violence against them...[৩১]

১৯৪৮ থেকে পরবর্তী : 'প্রতিপক্ষ' হিসেবে বাংলাভাষী মুসলমানরা

ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগকালে যেসব অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল, সেসব জনপদকে বেদনাদায়ক এক জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের পরিস্থিতি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ওই জটিলতার পটভূমিতেই 'দেশভাগ'-পরবর্তীকালে আপার আসামে মুসলমানদের ভাষাগত অধিকার অনেকখানি হারাতে হয় এবং অসমিয়ার একচেটিয়াত্ব মেনে নিতে হয়—শুমারির সময় এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও। তারপরও অসমিয়া জাতিবাদী রাজনীতি শান্ত হয়নি। ১৯৭৯ সালে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিতে ব্যাপকভাবে শুরু হয় 'বাঙ্গালি খেদাও' আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে অসমিয়া মধ্যবিত্ত, ভূ-স্বামী এবং উচ্চধনীদের ইন্ধন[৩২] (যদিও সামনে রাখা হয়েছিল ছাত্র-তরুণদের) দ্বারা সূচিত হলেও ক্রমে তাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের রাজনৈতিক মতাদর্শের আধিপত্য বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন অন্ধ মুসলমানবিরোধিতা ও বাংলাদেশবিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। এ সময় ধারাবাহিকভাবে বাঙালি মুসলমানবিরোধী অনেক দাঙ্গা হয় আসামে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৮৩ সালের ভয়াবহ 'নেলি গণহত্যা'। ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার একই সঙ্গে মুসলমানপ্রধান ১৪টি গ্রামে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে সরকারি হিসাবেই ১ হাজার ৮১৯ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। বেসরকারি হিসাবে মৃত মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। স্বভাবত প্রশ্ন

ওঠে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল একটি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এ রকম যুদ্ধংদেহিতার মূল কারণ কী?

সংক্ষেপে বললে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী আসামে ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্র কাঠামো এবং চা, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠননির্ভর যে শোষণকাঠামো ছিল, তাকে সম্পূর্ণ আড়াল করতেই প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু হয়েছিল বাঙালি মুসলমানদের। অসমিয়াদের আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়েছিল 'বহিরাগত'দের বিরুদ্ধে, এরপর সেটার অভিমুখ পাল্টে প্রতিপক্ষ করা হয় 'পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষদের' এবং পরে সেটাও পাল্টে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয় শুধুই 'বাংলাদেশি মুসলমান'দের। ক্রমে সব মুসলমানকে 'প্রতিপক্ষ' হিসেবে দাঁড় করানো শুরু হয়। পুরো ব্যাপারটি ঘটছিল ইংরেজি সেই প্রবাদের মতো: 'গিভ দ্য ডগ আ ব্যাড নেম অ্যান্ড হ্যাং হিম'। অর্থাৎ খুনের আগে কাউকে অবশ্যই একটা অপবাদ দিয়ে নাও। একটা বিকারগ্রস্ত প্রকল্পকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পুনঃপুনঃ প্রচারের মধ্য দিয়ে তাকে যৌক্তিক করে তুলতে হয়। মূল 'লক্ষ্যে' পৌঁছানোর আগে আসামেও ধাপে ধাপে তা-ই ঘটেছে। 'লক্ষ্যের' এই রূপান্তর আসামে কেন্দ্রীয় ভারতের আরএসএসের বিকাশে বেশ উপযোগী হয়েছিল।

আসামের 'বহিরাগত'-বিরোধী আন্দোলন ১৯৭৯ পরবর্তীকালে চূড়ান্তরূপে শুরু হলেও এবং ২০১৯ সাল নাগাদ তা সিদ্ধান্তসূচক পর্যায়ে পৌঁছালেও এটা কার্যত ১৯৪৮ সাল থেকেই পর্যায়ক্রমে শুরু হয়েছিল। নানা প্রক্রিয়ায় তখন থেকেই আসামের 'বাংলাদেশি'দের তাড়ানো শুরু। থেকে থেকে বাংলাদেশে পাঠানোও শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম বড় সংখ্যায় অসমিয়া মুসলমানদের বাংলাদেশে আগমন ঘটে ১৯৪৮-৫০ সময়ে। কেবল ১৯৫০ সালে প্রায় ৫৩ হাজার পরিবারকে আসাম ছেড়ে পূর্ব বাংলায় আসতে হয়। এটাই আসামে এখনো 'রায়টের বছর' নামে পরিচিত। এ সময় উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালের এপ্রিলে 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' হলেও আসাম থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদের বসতবাড়ি সংরক্ষণ না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল স্থানীয় হিন্দু শরণার্থীদের দিয়ে দেওয়ার পক্ষেই মত দেন।[৩৩]

এসব উদ্বাস্তু ছিল সে সময়কার 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলনে আসামে উদ্বাস্তু হওয়া হিন্দুদের অতিরিক্ত। এ রকম পরিস্থিতির মুখেই ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিতে থেকে যাওয়া বাংলাভাষী মুসলমানরা নিরাপত্তার স্বার্থে নিজেদের অসমিয়াভাষী মুসলমান পরিচয় দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে ১৯৫০ পরবর্তীকালে আসামের শুমারিগুলোতে অসমিয়াভাষীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যে বিষয়ে এ লেখার শুরুতে বলা হয়েছে। এটা ছিল মুসলমানদের সেখানে টিকে থাকার এক

মরিয়া কৌশল মাত্র। অন্যদিকে, ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালের শুমারিতে আসামে মুসলমানদের হিস্যা কমে যাওয়ার পেছনে কেবল সিলেট আলাদা হওয়াই প্রধান কারণ ছিল না—নিয়মিত বিরতিতে দাঙ্গাজনিত উচ্ছেদও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। বি পি মিশ্র নামে আসামের একজন গবেষক দাবি করেছেন, ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় আসামের গোয়ালপাড়া থেকে ৬০ হাজার, কামরূপ থেকে ২০ হাজার এবং দরং থেকে প্রায় ৬ হাজার মুসলমানকে উৎখাত হয়ে পূর্ব বাংলায় আসতে হয়েছিল।[৩৪]

তবে ঘটনার নির্মমতায় ১৯৬০ সালের আসামদাঙ্গা ছিল বাংলাভাষীদের জন্য তার চেয়েও ভয়াবহ। এই দাঙ্গার সময়ই বিখ্যাত দুই শিল্পী আসাম গণনাট্যের হয়ে ভূপেন হাজারিকা ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা করেছিলেন *হারাধন রঙমন কথা*, যার উপজীব্য ছিল জাতিবিদ্বেষী আক্রমণে ঘর হারানো বাঙালি চাষি হারাধনের ব্যথিত জিজ্ঞাসার বিপরীতে সহমর্মী অসমিয়া চাষি রঙমনের উত্তর। সুদীর্ঘ সেই গীতিনাট্যে একপর্যায়ে রঙমনের কণ্ঠে ভূপেন গেয়েছিলেন :

লুইতর চাপরিত চাকৈয়ে কান্দিলে মানুহর নও খন চাই
মানুহর দুখতে মানুহ বুরিব আনকছোন দোষিবর নাই
[চখা কাঁদে চখী কাঁদে ব্রহ্মপুত্র চরে
নিজের হাতে ডুবিয়ে 'নাও' মানুষ ডুবে মরে]

দাঙ্গা ছাড়াও ভারত এবং আসাম সরকারের নেওয়া আইনগত কিছু পদক্ষেপের কারণেও পরবর্তীকালে আসাম থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন সময় মুসলমানদের পূর্ব বাংলায় আসা অব্যাহত থাকে। যেমন ১৯৬২ সালে 'Prevention of Infiltration from Pakistan (PIP)' কর্মসূচি নেওয়া হয়। এটাকে আসামের সাধারণ জনগণ তখন 'কুইট ইন্ডিয়া নোটিশ' বলত। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সীমান্ত এলাকাগুলো তল্লাশি করে সন্দেহজনক যে কাউকে 'অপর পাড়ে' পাঠিয়ে দিতে পারত। এ সময় হাজার হাজার মুসলমান পূর্ব বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়। সিলেট অঞ্চলে এ রকম মানুষদের বসতিকেই তখন বলা হতো 'আসাম পাড়া', 'রেফিউজি কলোনি' ইত্যাদি, যার চিহ্ন আজও বিলীন হয়নি। আসামের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়া একদা স্বীকার করেছেন, ১৯৬১-৬৯ সময়ে অন্তত ১,৯২,০৭৯ জনকে (প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে) পূর্ব বাংলায় পাঠানো হয়েছিল।'[৩৫] এ রকম বাস্তবতায় যে পূর্ব বাংলা থেকে নতুন করে আসামে অভিবাসন দুরূহ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। তারপরও আসামে রাজনৈতিক চাপে ঘটে ঠিক উল্টো ঘটনা। গঠিত হয় 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল কোর্ট'। মূলত অসমিয়া ভোটব্যাংককে সন্তুষ্ট করতেই ১৯৮৫ সালে এ রকম আদালত গঠন ব্যাপকতা

পায় এবং ২০১৫ সালে তা ১০০ ও ২০১৯ সালে ৩০০টিতে উপনীত হয়। বাংলায় এগুলোকে নাম দেওয়া হয়েছে 'বিদেশি ন্যায়াধিকরণ আদালত'। তবে জনসমাজে ইংরেজি নামটিই চালু হয়েছে।

আসামে বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত বৈরিতার সর্বশেষ এক পদ্ধতি হলো 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল কোর্ট'। এই কোর্টই এখন এনআরসি থেকে বাদ পড়া ১৯ লাখ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। সচরাচর এই আদালতগুলোতে 'সন্দেহজনক ভোটার'দের মামলাগুলো পাঠানো হয়। তখন 'সন্দেহভাজন'কেই প্রমাণ করতে হয়, তারা আসামের নাগরিক। ভোটার তালিকায় নিজের বা পূর্বপুরুষদের নাম, ঠিকানা, বয়সে কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলেই তাঁদের নাম ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর ট্রাইব্যুনাল তাঁদের দৃষ্টিতে কাউকে 'বিদেশি' সাব্যস্ত করলেই তাঁকে আসাম বর্ডার পুলিশ[৩৬] নিয়ে যাচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। আসামজুড়ে ইতিমধ্যে এ রকম ছয়টি ডিটেনশন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মূলত বাংলাভাষীরাই ট্রাইব্যুনাল ও ডিটেনশন ক্যাম্পগুলোর কার্যক্রমের শিকার হচ্ছে। এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮০ হাজার ১৯৪ জনকে 'বিদেশি' ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংখ্যাটিতে দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৩৯৯ জন। অর্থাৎ ১৪ মাসে ১৩ হাজার ২০৫ জন; মাসে ৯৪৩ জনকে বিদেশি ঘোষণা করা হচ্ছিল। এর মধ্যেই আসামে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অব ইন্ডিয়ান সিটিজেন'-এর (এনআরসি) খসড়া ঘোষণার মাধ্যমে ৪০ লাখ স্থানীয়কে 'নাগরিক নয়' ঘোষণা করে। পরে ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত এনআরসিতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ লাখ ৬ হাজার বাসিন্দা। বর্তমানে এই মানুষেরা একদিকে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় এবং অন্যদিকে ফরেনার্স ট্রাইবুন্যালে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অপেক্ষায়। এনআরসি ছিল কার্যত আসাম-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক মৈত্রীর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ভারতের নীতিগত অবস্থানের এক প্রকাশ, যার আরেক প্রকাশ ছিল সীমান্তের 'কাঁটাতার নীতি'।

সম্পর্কের সোনালি অতীত যখন কাঁটাতারময় হয়ে গেল

'অবৈধ' অভিবাসন ও 'এনআরসি'র প্রচারণাকে সামনে রেখেই নয়াদিল্লি বিগত দশকগুলোতে আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারধর্মী দেয়াল নির্মাণ অব্যাহত রেখেছিল। আবার একই সময়ে বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করেই মূল ভারত থেকে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে সুবিধাজনক যোগাযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছে।[৩৭] অর্থাৎ আসামের বাংলাদেশনীতি স্পষ্টভাবে দ্বিমুখী।

২০১৯ সালের মার্চে আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তের কিছু স্থানে ভারত সরকার সরাসরি কাঁটাতার না বসিয়ে 'স্মার্ট ফেন্সিং' প্রযুক্তির আওতায় এনেছে। যে

প্রযুক্তিতে মূলত লেজারের মাধ্যমে (শরীরী অবকাঠামো না বসিয়েই) সীমান্তে মানুষের চলাচল শনাক্ত করা হয়। অত্যাধুনিক সেন্সর প্রযুক্তির মাধ্যমে এ রকম নজরদারি পানি এবং মাটির নিচেও করা যায়। আবার এ রকম লেজার মানুষকে আহত করার জন্য বুলেটের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ২০১৯ সালের ৫ মার্চ ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বাংলাদেশ-আসাম সীমান্তের অন্তত ৬১ কিলোমিটারে এ রকম লেজার প্রযুক্তির স্মার্ট ফেন্সিং স্থাপনার উদ্বোধন করেছেন।[৩৮] এর মধ্য দিয়ে কার্যত বাংলাদেশ-আসাম সীমান্তের পুরোটাই (২১৫ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত এবং ৪৮ কিলোমিটার নদীময় সীমান্ত) কেন্দ্রীয় ভারতের কঠোর নজরদারিতে চলে এল। সর্বশেষ যে স্থানে 'স্মার্ট প্রযুক্তি'র অশরীরী দেয়াল কার্যক্রম শুরু হলো, সেটা আসামের ধুবড়িসংলগ্ন এলাকা। ধুবড়ি আসামের মুসলমানপ্রধান একটা জেলা, যা বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের লাগোয়া। ধুবড়ি সীমান্ত দিয়েই ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই সীমান্তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দেয়াল নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত একাধিক অবকাঠামোর মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে[৩৯]—যা সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে নদীভাঙনের তীব্রতা বাড়াতে ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য সীমান্তেও বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত দেয়ালের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। ৪ হাজার ১৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বহু ধরনের প্রযুক্তিতে নির্মিত এসব সীমান্ত দেয়ালের কারণে অনেক গ্রাম ও জনপদের শতাব্দীপ্রাচীন ভূখণ্ড ও বসতি বিপজ্জনকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।[৪০] আসামের ধুবড়িতে দেখা গেছে, সীমান্ত দেয়ালের দুই পাশে পড়ে গেছে দুই দেশের অনেক পরিবারের জমি। এসব জমির মালিকেরা সেখানে এখন চাষাবাদ করতে পারছেন না। অথচ স্মরণাতীতকাল থেকে তারা এখানে আছে এবং ছিল।

ঠিক পূর্ববর্তী দশকে (২০০৮-২০১৮) বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্কে ভারতের বিপুল সন্তুষ্টি দেখেছে বিশ্ব। অথচ এর মধ্যেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার ও অন্যান্য প্রযুক্তির সীমান্ত দেয়াল নির্মাণ আবশ্যিকভাবে এই ধারণাই দেয়, ছোট নিকট প্রতিবেশীকে তারা আসলে 'বিপজ্জনক'ই গণ্য করছে। এমনকি কাঁটাতার ও দেয়াল নির্মাণের পরও অবৈধ অভিবাসনের প্রচারণা থামছে না। চূড়ান্ত জাতীয় নাগরিক তালিকার পরও সেই প্রচারনা আছে।

অথচ আসাম ও বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, মানবিক ও সম্পদগত একক সম্পর্কের দীর্ঘ সাক্ষ্য। তাকে ছাপিয়ে রাজনৈতিক পণ্য হিসেবে 'অবৈধ অভিবাসনের' ধারণাই বাজারে সফলতা পেয়েছে। বাংলা ও আসামের

রাজনৈতিক সমাজের অসাম্প্রদায়িক ও মৈত্রীবাদী অংশ অতীত সম্পর্কের সত্য ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে কাঁটাতার সংস্কৃতি রুখতে পারেনি—এটা রূঢ় এক বাস্তবতা। উপরন্তু সমকালীন রাজনীতির প্রয়োজনে ইতিহাসের কাঁটাতারময় ব্যাখ্যা খোঁজার প্রাত্যহিক অপচেষ্টাই চলছে, যার বলি হিসেবে এনআরসির মাধ্যমে ইতিমধ্যে আসাম দেখছে লাখো মানুষের 'রাষ্ট্রবিহীন' হয়ে পড়ার অবিশ্বাস্য অমানবিক এক অধ্যায়, যে অমানবিকতার আঁচ লাগছে ইতিমধ্যে আসামের বাইরেও। কারণ, আসামের ইতিহাস কেবল আসামের নয়, বাংলারও। চূড়ান্ত এনআরসিতে ১৯ লাখ মানুষ বাদ পড়ামাত্র আসামের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও অর্থমন্ত্রী হিমান বিশ্বশর্মা এই 'বিদেশি'দের গ্রহণের জন্য বলেছেন বাংলাদেশকে। এ ধরনের আহ্বান বাংলাদেশকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের দুঃসহ স্মৃতি। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এক বড় উদ্বেগ হয়ে উঠল এখন এনআরসিতে রাষ্ট্রীয় 'পরিচয়হীন' আসামের বাসিন্দারা।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. আসামে বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক (কোর্ট ল্যাংগুয়েজ) ভাষা করা ছিল পূর্ব বাংলার সঙ্গে আসামের অংশীদারত্বের এক ঐতিহাসিক বড় জায়গা। আবার একই সঙ্গে এটা ছিল অসমিয়াদের মধ্যে বাংলাভীতিরও এক প্রধান ঐতিহাসিক উৎস। আসামে প্রচুর বাংলাভাষী থাকলেও বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার যৌক্তিকতা ছিল তর্কসাপেক্ষ। কারণ, অসমিয়ারা সেখানে অনেক জেলাতে তখনো গুরুত্বপূর্ণ প্রধান জনগোষ্ঠী ছিল। তা দিয়ে দাপ্তরিক কাজ চলছিল না। বাংলা আসামে দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কিছু সময় পর থেকে অসমিয়ারা মনে করতে শুরু করে—তাদের ভাষাবঞ্চনা শুরু হলো। এটা ছিল অসমিয়া জাতীয়তাবাদের একটা সূচনাবিন্দু এবং একই সঙ্গে বাংলাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবারও প্রাথমিক এক কারণ। যার পরিণতিতে ভারত বিভক্ত হওয়া মাত্র ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে গোপীনাথ বরদৈল শিলচরে গিয়ে জানিয়ে দিলেন, অসমিয়াই হবে রাজ্যের দাপ্তরিক ভাষা। তাঁর এই মনোভাবও ছিল অযৌক্তিক। কারণ, আসামে তখনো প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ছিল বাংলাভাষী। বরাক উপত্যকায় তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে অসমিয়ারাও একই ভুল করে, যা করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তি ১৮৩৬ সালে। ১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বর আসামের আইনসভার প্রথম সভায় গভর্নর আকবর হায়দরি বাংলাভাষীদের জন্য একটা খারাপ বার্তা দিয়ে বললেন,

> 'The native of Assam are now masters of their own house. They have a government which is both responsible and responsive of them… the Bengalee has no longer the power, even if he had the will, to impose any thing on peoples of these Hills and valleys which constitute Assam.'

আর গোপীনাথ বরদৈল জানালেন, "It is not the intention of the Government to make Assam a bilingual state and for the sake of homogeneity of province

...All non-Assamese to adopt Assamese language."

এই ছিল আসামে বাংলাভাষীদের আজকের যন্ত্রণাময় জীবনের শুরুর ক্ষণ। এভাবেই রাজনীতিবিদেরা রাজনৈতিক প্রয়োজনে 'বাংলা বনাম অসমিয়া' বৈরিতায় জ্বালানি জোগায়। ১৯৪৮ সালেই অসমিয়া-বাঙালি দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় আসামে। তারপর ১৯৫০ সালের দাঙ্গা। বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে দলে দলে মুসলমানকে কোচবিহার ও পূর্ব বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়।

আজ যখন আসামে কেবল মুসলমানদের আগমনের গল্প শোনা যায়, তখন এটা প্রায় ধামাচাপাই দেওয়া হয় যে ১৯৫০-এর দাঙ্গায় লাখো বাংলাভাষী মুসলমানকে আসাম থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে ঠাঁই নিতে হয়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে গোয়ালপাড়া পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হতে চাইলে আরেকবার বাংলাভাষী-অসমিয়া দাঙ্গা বাধে। সে সময়ও বহু বাংলাভাষী আসাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায় চলে যান। ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালের এই দুই দাঙ্গার পর ঘটে ১৯৬০ সালের ভাষা আন্দোলন, যে আন্দোলনে ১১ জন বাংলাভাষী মারা যান এবং প্রচুর নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। প্রায় চার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়। সবচেয়ে বড় বিষয়, আসামের এই ভাষাবিবাদ সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ঘৃণার রাজনীতি ছাড়া বিশেষ কিছু আর দেয়নি। অসমিয়া মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা ভাষার লড়াইকে রাজনৈতিক আধিপত্যের কাজে যতটা ব্যবহার করেছে—খোদ ভাষার বিকাশে তেমন কিছু ঘটেনি। ক্রমেই ইংরেজি তার স্থান নিচ্ছে। বিস্তারিত দেখুন : দয়াসাগর কলিতা, বাংলা অনুবাদ : সুশান্ত কর, বাঙালি বিদ্বেষের রাজনীতি : প্রসঙ্গ ১৯৬০-এর সংঘর্ষ, https ://bit.ly/2HtAWyf

২. Habib Fazlul Basid, "The Assamese Language Issue : An Analysis from Historical Perspective", *International Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 6, Number 2 (2016), pp. 125-133, Research India Publications.

৩. শুমারিকালে বাংলাভাষীদের নিজেদের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অসমিয়াকে মাতৃভাষা হিসেবে উল্লেখ করা সঠিক কৌশল হয়েছে কি না—এ নিয়ে আসামের বাংলাভাষী সমাজে আজও ব্যাপক বিতর্ক আছে। একদল মনে করে, ঐতিহাসিক একটা ভুল সিদ্ধান্ত এটা। তারা এমনকি প্রতি শুমারির আগে আসামে বাংলাভাষীদের প্রতি আহ্বান জানায় শুমারি দলিলে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে উল্লেখ করার জন্য। এ রকম একটা সামাজিক আন্দোলনের নাম হলো 'চলো পাল্টাই'। এই আন্দোলনের নেতারা মনে করছেন, বাংলাভাষীরা সঠিকভাবে শুমারিতে নিজেদের মাতৃভাষার উল্লেখ করলে আসামে সর্ববৃহৎ ভাষা হবে বাংলা। শুমারিতে যতজন অসমিয়া ছেড়ে বাংলাকে পূর্বপুরুষদের মতোই আবার মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করবেন, অসমিয়ার হিস্যা থেকে ততজনই কমে যাবে। এ রকম বিবেচনা থেকে 'চলো পাল্টাই'-এর সংগঠকেরা ২০২১ সালের আসন্ন শুমারিতে নিজেদের পূর্বসিদ্ধান্ত সংশোধনের জন্য ব্রহ্মপুত্রের বাংলাভাষীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। এই প্রচারাভিযানকে তাঁরা বলছেন, 'মিশন ২০২১'। তবে এ রকম উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাঙালি বংশোদ্ভূত অসমিয়াভাষীদের তরফ থেকে প্রতিবাদ আছে। তাঁরা মনে করছেন, এতে বৃহত্তর অসমিয়া সমাজে তাঁদের সমন্বিত হওয়া বাধাগ্রস্ত হবে। গুয়াহাটির একটি থানায় 'চলো পাল্টাই' প্রচারাভিযানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় ২০১৯ সালের মে মাসে অভিযোগ দায়েরও হয়েছে। 'চলো পাল্টাই' সামাজিক

আন্দোলনের সমন্বয়ক হলেন কলকাতায় গর্গ চট্টোপাধ্যায়, দিল্লিতে চন্দন চট্টোপাধ্যায় এবং আসামে শান্তনু মুখোপাধ্যায়।

৪. পরবর্তীকালের ঘটনাবলিতে প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাভাষীদের জন্য অসমিয়াকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণের কৌশলও কার্যত কোনো ইতিবাচক ফল দেয়নি। কারণ, অসমিয়াভাষী হয়েও তারা জাতিবিদ্বেষ থেকে রেহাই পায়নি—ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে।

৫. Habib Fazlul Basid, Ibid and Census of India 2011. https ://bit.ly/2XjInAX

৬. এ সময়কার আসাম পূর্ব বাংলা থেকে প্রশাসনিকভাবে পৃথক হলেও সেখানে অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাভাষী প্রধান সিলেট ও গোয়ালপাড়াই রাজনৈতিক-অর্থনীতির জায়গায় প্রভাবশালী ছিল।

৭. https ://bit.ly/2GZsrKZ

৮. Binay Kr. Nath, *Immigration from East Bengal into Nowgong district : Roots and resettlement 1901 AD 1951 AD*, Gauhati University, 2014, Shodhganga, p. 62, https ://sg.inflibnet.ac.in/handle/10603/127641

৯. এই আলোচনা আরও সমৃদ্ধ হতে পারত আসাম ও পূর্ব বাংলার ডাকব্যবস্থার সম্মিলিত বিকাশধারাকে বিবেচনায় নিলে। ১৮৭৩ সালে পূর্ব বাংলার মতোই আসাম পোস্টাল সার্ভিসের সদর দপ্তরও ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল ৩০টি নৌকা সম্বল করে। কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখতেই এখানে সেই আলোচনার বিস্তৃতি ঘটানো হলো না।

১০. Report on the census of Assam, 1901, Chap. II. *Census of India*, 1901, Vol IV.by B C Allen. Shillong, 1902. p.16. সেদিনের এই গোয়ালপাড়াই আজকের আসামের পশ্চিমাঞ্চলীয় চারটি জেলা।

১১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ.১৪।

১২. প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, আসামের গবেষকেরা বরাবরই দাবি করেন, ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দশকগুলোতে আসামের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলোতে পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপক অভিবাসন হয়েছে। এই দাবি যদিও বর্তমান লেখকের বিভিন্ন লেখায় অন্যত্র ব্যাপকভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে—তবে এখানে নমুনা হিসেবে শুধু গোয়ালপাড়ার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা করলেও তার সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯২১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এই তিন দশকে গোয়ালপাড়ায় জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৪.৬, ১৩.৮ এবং ৮.৮ শতাংশ। অথচ একই সময়ে সমগ্র আসামে দশওয়ারি জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১৭.৬, ১৭.৯ এবং ১৭.৪ শতাংশ। অর্থাৎ সমগ্র আসামে যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে, গোয়ালপাড়ায় তার চেয়ে অনেক কম হারে বেড়েছে। বিস্তারিত দেখুন, Census of India 1951, V. XII, c,,. 29 I 42.

https ://bit.ly/2WKSwSM

১৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭।

১৪. প্রেসিডেন্সিগুলোর (বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ) গভর্নরের মর্যাদা ছিল চিফ কমিশনারের

ওপরে। ১৯১৯ সালে এক সংস্কারের মাধ্যমে সব ধরনের প্রদেশের গভর্নরের এক রকম মর্যাদা করা হয়। অর্থাৎ প্রদেশগুলোর মর্যাদা সমরূপ করা হয়।

১৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১.

১৬. মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে ব্যারিস্টার হিসেবে একটি আইনগত লড়াইয়ে অংশ নিতে ১৮৯৩ সালে। ইতিহাসের ওই সময়ে আফ্রিকায় ভারতীয়দের ব্যাপক উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক চলছিল। সেভাবে ভাসানী আসাম যাওয়ার পর দেখছিলেন পূর্ববঙ্গীয়দের আপার আসামে উপস্থিতি নিয়ে বৈরী মনোভাবের জন্ম হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৮৬০ থেকে ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছিলেন কাজের উদ্দেশ্যে। গান্ধী সেখানে যাওয়ার পর দেখতে পান 'ভারতীয়'দের ভোটাধিকার থাকা উচিত কি না—এ নিয়ে সাদা শাসকেরা নেতিবাচক মনোভাব দেখাচ্ছে। ঔপনিবেশিক শক্তি তখন আফ্রিকায় শেতাঙ্গদের বাইরে কাউকে ভোটাধিকার দানের বিপক্ষে ছিল। গান্ধী তখন আইন পেশার স্বাভাবিক দায়িত্বের বাইরেও ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, যা তাঁকে কালক্রমে 'মহাত্মা' পরিচয় এনে দেয়। ১৯০৩ সালে সেখানে সংবাদপত্রও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ১৯১৪ সালে তিনি চূড়ান্তভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন। অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীও চূড়ান্তভাবে পূর্ব বাংলায় চলে আসার আগে আসামের দরিদ্র বাংলাভাষীদের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের পক্ষে ব্যাপক সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করছিলেন, যার অংশ হিসেবে ১৯৪৬ সালের মে মাসে তিনি অহিংস এক আমরণ অনশন কর্মসূচিরও ডাক দিয়েছিলেন। এ সময় আসামের বিভিন্ন স্থানে দরিদ্র মুসলমান চাষিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পুলিশি নির্যাতন চলছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক সমাবেশ-আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি মাওলানা নিজে প্রতিবাদস্বরূপ রোজা রাখতেন বলে জানা যায়। এভাবে তিনি এক নাগাড়ে ৬১ দিন রোজা রাখেন। মাওলানার ওই সময়কার একজন সঙ্গী সাহিত্যিক সাংবাদিক দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার আবুল কালাম শামসুদ্দিনের লেখনী থেকে তার প্রত্যক্ষ বিবরণ মেলে (*অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৮৩-২৯২)। সৈয়দ আবুল মকসুদও (*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০) এই বিষয়ে লিখেছেন। লক্ষণীয়, ভারতের অন্যত্র ইতিহাসের এই সময়ে গান্ধীর অহিংস আন্দোলন যেভাবে ইতিহাসবিদদের মনোযোগ পেয়েছে, আসামে নিম্নবর্গের কৃষকদের জন্য ভাসানীর একই রকম অহিংস আন্দোলন তদ্রূপ কোনো মনোযোগ পায়নি। গান্ধীর 'লবণ সত্যাগ্রহ' নিয়ে ইতিহাসে অসংখ্য প্রশংসামূলক গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু ভাসানী মানকারচরে বর্ণবাদী লাইন প্রথার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের মার্চে যে অহিংস অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন, তার বিবরণ আজও বিস্তারিত লেখা হয়নি।

১৭. লাইন প্রথার সারমর্ম ছিল বাঙালি চাষি সমাজকে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকায় আটকে রাখা, তারা যাতে আসামের উন্নত ভূ-সম্পদের মালিক হয়ে যেতে না পারে। এটা ব্রিটিশ আমলের একটা নতুন ধারার অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ ছিল। স্থানীয় লোকদের ভূ-সম্পদ রক্ষার কথা বলে এটা করা হয়।

১৮. এরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা একটা স্বতন্ত্র ধারা। বিশেষত কংগ্রেসের মধ্যে যারা ব্রিটিশদের বয়কট আন্দোলনের মধ্যেও নির্বাচন করতে ইচ্ছুক ছিল, সেই উপদল। আসামের মতোই বাংলায়ও তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

১৯. এর পূর্বেকার পরিষদে ক্ষমতার পরিসর ছিল সীমিত। পরিষদীয় এই ব্যবস্থায় এ সময় একের পর এক কিছু সংস্কার সাধিত হচ্ছিল। ১৯১৯ সালে আসামের ৫৩ সদস্যবিশিষ্ট পৃথক প্রাদেশিক পরিষদে ৩৯ জন নির্বাচিত হতেন। এই ৩৯ জনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য ১২টি সংরক্ষিত ছিল। পাঁচটি ছিল চা-বাগানমালিকদের জন্য। বাকিগুলো ছিল সাধারণ আসন। ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের শর্ত ছিল। যেমন একটি শর্ত ছিল বছরে অন্তত ১৫ রুপি কর দেওয়ার রেকর্ড। এ রকম নিয়মকানুনের কারণে ভোটার সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। ১৯২৩ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে আসামে পড়েছিল ৮৩ হাজার ৩২০ ভোট। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভোটার হওয়ার শর্ত কিছুটা শিথিলের পরও তখনকার ৬১ লাখ ৬৫ হাজার ৬১২ জনসংখ্যার বিপরীতে ভোটার ছিলেন মাত্র ৮ লাখ ১৫ হাজার ৩৪১ জন। *The Assam legislative assembly 1962 1972 and its impact on the socio political set up of Assam*, Kunja Medhi, Gauhati University,https ://bit.ly/2VhlUEz

২০. তখনকার ওই চিত্রের সঙ্গে বর্তমান বাস্তবতাটি তুলনা করা যেতে পারে। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত আসামের বিধানসভার সর্বশেষ নির্বাচনে ১২৬ আসনে মুসলমান জিতেছেন ২৯ জন, যা সমগ্র বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ। এর পূর্ববর্তী বিধানসভায় এই সংখ্যা ছিল ২৮। অর্থাৎ ১৯৩৭-পরবর্তী সর্বশেষ ৮০-৯০ বছরের ব্যবধানে আসামের নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। যদিও সমগ্র ভারতজুড়ে প্রচার চলছে আসামে মুসলমান আধিপত্যের কথা।

২১. মোহাম্মদ তোয়াহা, *স্মৃতিকথা*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৩২।

২২. ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতের সংবিধান রচনাকারী আট সদস্যের কমিটিতেও উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন সৈয়দ সা'দুল্লাহ। আসামের পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে থাকলেও কার্যত তা না ঘটায় জিন্নাহর অন্যতম সহযোগী সা'দুল্লাহ ভারতেই থেকে গিয়েছিলেন। আসামের কৃষির বিকাশে তাঁর শাসনামলের বিশেষ অবদান ছিল। এ লক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির নিচু এলাকাগুলোতে পূর্ববঙ্গ থেকে চাষিদের আগমনকে ইতিবাচক চোখে দেখতেন তিনি। ফলে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির মুসলমান হয়েও ওই ভ্যালির অসমিয়াদের কাছে অপেক্ষাকৃত অপছন্দনীয় ছিলেন।

২৩. এ পর্যায়ে উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচন শেষে পূর্ব বাংলায়ও যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বে তফসিলিদের সঙ্গে মুসলিম লীগের ঐক্যের ঘটনা ঘটে, যা তখনকার আসাম পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বাংলা ও আসামে তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের একাংশের যেকোনো উপায়ে ক্ষমতা পাওয়ার রাজনীতির পাশাপাশি নিপীড়িত বর্গ হিসেবে দলিত-আদিবাসী-মুসলমানদের ঐক্যের আদর্শবাদী ধারাটিও যে উপস্থিত ছিল, এই অভিজ্ঞতা তার সাক্ষ্য দেয়। দেখুন, আলতাফ পারভেজ, *দেশভাগ ও যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯।

২৪. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ফল নিয়ে আলাপ-আলোচনার লক্ষ্যে। তবে এই অধিবেশনেই তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির ন্যায্যতার ব্যাখ্যা দেন। ২৩ মার্চ এটা প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ছিল ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে উপনিবেশ-উত্তর

সময়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আসামের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলোতে এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের প্রতি জনসমর্থন বাড়ায়। এই প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দ ছিল না। তবে তাৎক্ষণিকভাবে মুসলিম লীগবিরোধী প্রচারমাধ্যম একে 'পাকিস্তান ধারণা' হিসেবেই প্রচার করতে শুরু করে।

২৫. প্রাদেশিক সভায় প্রভাবশালী ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা একদিকে ব্যবস্থা হিসেবে 'লাইন প্রথা'র পক্ষে এবং অন্যদিকে এর অমানবিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্ক ও বিবাদ জিইয়ে রাখতে তৎপর ছিলেন। তাঁদের কৌশলটি ছিল বেশ ফলদায়ী। এর মধ্য দিয়ে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পুরো সময় আসামে চা, কাঠ, তেল ইত্যাদি খাতে ব্রিটিশদের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো বিতর্কই হয়নি পরিষদে।

২৬. অন্তত ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আসামে মুসলমান প্রভাবিত আর কোনো দল থাকেনি। কারণ, ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালে সা'দুল্লাহও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান সংগঠককে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কয়েক বছর পর সা'দুল্লাহ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেও দলটির সঙ্গে আসামের মুসলমানদের ভোট-বন্ধন অক্ষুণ্ন থাকে অন্তত ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত।

২৭. Habibullah Mazumder, *Nationalists vs, Communalists*, Assam University, 2007, p. 233. http ://hdl.handle.net/10603/93010

২৮. বিস্তারিত দেখুন, Amalendu Guha, "East Bengal Immigrants and Maulana H. K. Bhasani in Assam Politics, 1928-47", CSSS, Calcutta, *The Indian Economic & Social History Review*, 1976, vol. 13, issue 4, 419-452.

২৯. Dr. Amalendu Guha, *Plant Raj to Swaraj : Freedom Struggle and Electroral Politics in Assam 1926-47*, New Delhi, PPH, 1988, p.206.

৩০. Vani Borooah, *The Killing Fields of Assam : The Myth and Realities of It's Muslim Immigrations*, University of Ulster. 2012. p. 4. এ রকম কর্মসূচির প্রতি অসমিয়া পুঁজিপতিদেরও এক ধরনের সায় ছিল, বিশেষ করে তখন যাঁরা সুদের বিনিময়ে অর্থ খাটাতেন। চাষি সমাজের মধ্যে এসব ব্যবসায়ী সুদে অর্থ খাটিয়ে ভালো ব্যবসা করতে পারতেন। কারণ, এ ধরনের চাষিরা ছিলেন অসমিয়াদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিশ্রমী এবং ঋণ শোধে অধিক নির্ভরযোগ্য।

৩১. Hiren Gohain, "Debate : Ignoring Assam's Colonial Past While Discussing NRC Is Academic Escapism", *The Wire*, 26 Feb 2019.

https ://bit.ly/2VGTdML

৩২. এই ইন্ধনের স্পষ্ট কারণ ছিল। কারণ, অসমিয়া মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি রাজনীতিতে চ্যালেঞ্জমুক্ত থাকতে চাইলেও ১৯৭৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল তাদের উদ্বিগ্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই নির্বাচনে আসামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কমিউনিস্ট দলগুলো অত্যন্ত ভালো ফল করে। ইতিহাসের একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। আসামে ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে ওই একই বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলো ২২টি আসন পায় (১২৬ আসনের মধ্যে)। ১৯৫২ সালে এসব

দল মাত্র ১টি আসন, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ৫টি আসন, ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কোনো আসনই নয় এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে মাত্র ৭টি আসন পেয়েছিল। ১৯৭৮ সালে তারা মোট আসনের ১৭ শতাংশ এবং ভোটের ১৫ শতাংশ পেয়ে অসমিয়াদের চমকে দেয়। এই বামদের সমর্থক ভিত্তির বড় অংশই ছিল বাংলাভাষীরা। ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের প্রধান ইস্যু ছিল 'রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা'। এই নির্বাচনের পরপরই শুরু হয়ে যায় 'বিদেশি খেদাও আন্দোলন' এবং আসামের ইতিহাসে আর কখনোই 'রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা' নির্বাচনী বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৭৯ সালেই গঠিত হয়েছিল নিখিল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ, যাদের পরবর্তীকালে 'বিদেশি খেদাও' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। এবং পরের নির্বাচনেই (১৯৮৩) সেখানে নির্বাচনী প্রচারণা দখল করে রাখে 'বাংলাদেশি অবৈধ বাসিন্দা' ইস্যু। ২০১৯ সাল পর্যন্ত একই ইস্যুর রাজত্ব চলছে সেখানে। এ-ও তাই বিস্ময়কর নয় যে ১৯৮৩ সালেই বামফ্রন্টের আসন পূর্বতন ২২টি থেকে কমে ৩টিতে নেমে আসে। সমগ্র ঘটনাটি ঘটে খুবই পরিকল্পিত উপায়ে। বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে এ সময় বাংলাভাষীদের দল হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে অসমিয়া বিরুদ্ধবাদীরা। সামাজিক মনোজগতে অসমিয়া বনাম বাংলাভাষী দূরত্ব বাড়তে থাকে।

৩৩. Abdul Mannan, *Infiltration : Genesis of Assam Movement*, Ayan, Assam, 2017, p.108-09.

৩৪. Anindita Dasgupta, "The myth of the Assamese Bangladeshi", *Himal*, 31 July 2018, https ://bit.ly/2T0NOQD.

৩৫. Abdul Kalam Azad, "Assam NRC : A History of Violence and Persecution", *The Wire*, India, 15 August 2018. https ://bit.ly/2MhFyf3

৩৬. আসাম একমাত্র রাজ্য ভারতে—যার নিজস্ব বর্ডার পুলিশ রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে মুসলমানবিদ্বেষী ভূমিকার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

৩৭. এমনকি কাঁটাতার বসানোর ফাঁকে ভারত আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তের অন্তত তিনটি স্থানে (ধুবড়ির গোপালগঞ্জ ও মানকারচর এবং করিমগঞ্জের সুতারকান্দি) 'বর্ডার ট্রেড পয়েন্ট'ও গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে প্রভাবিত করা হয়েছে এই সময়।

৩৮. "Assam border gets smart fences", *The Daily Star*, March 06, 2019, https ://bit.ly/2vrehvJ.
ভারতীয় প্রচারমাধ্যমে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগকে বলছে,
'BOLD-QIT (Border Electronically Dominated Quick Response Team Interception Technique) under the Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS)'. https ://bit.ly/2ZKdALS

৩৯. 'Pontoons, airships to plug India-Bangladesh border in Assam', 13 July 2018, *The Economic Times*, https ://bit.ly/2PFDFr1

৪০. ২৩ জুলাই ২০১৯ সালে ভারতীয় লোকসভায় দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, সর্বশেষ পাঁচ বছরে বাংলাদেশ সীমান্তে বিভিন্ন ধরনের দেয়াল

নির্মাণ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ভারতের খরচ ১১৩৮ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। Rs 1,138.48 cr spent in Indo-Bangla border fencing in 5 years, *North East Now*, July 23, 2019, https ://bit.ly/2YoX0Ue

ভূ-রাজনীতি

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের ভূকৌশলগত গুরুত্ব : আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে সমুদ্র, জ্বালানি ও পরিবহন সংযোগ

শ্রুতি এস পাটানায়েক

সারসংক্ষেপ

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অর্থনৈতিকভাবে সংযুক্ত একটি একক অঞ্চল। তবে কৌশলগত কারণে ভারত বঙ্গোপসাগরকে আন্দামান সাগর থেকে আলাদা হিসেবে দেখে থাকে। ২০০০ সাল থেকে ভারত সে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাসহ একটি অর্থনৈতিকভাবে সংযুক্ত অঞ্চল হয়ে ওঠার গুরুত্ব অর্জন করে। মিয়ানমার ছাড়া এ অঞ্চলের সব দেশই গত এক দশকে ৬ থেকে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই দেশগুলো সন্ত্রাসবাদ ও মাদক পাচারের মতো অভিন্ন সামুদ্রিক নিরাপত্তাজনিত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে বিনিয়োগ করেছে। টেকসই উন্নয়নের অংশ হিসেবে সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমিতে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। বিদ্যমান একাধিক দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভবিষ্যতে এ অঞ্চল একটি একীভূত অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাবলয় হিসেবে আবির্ভূত হবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

সহযোগিতা, সংযোগ, সামুদ্রিক, নিরাপত্তা, উপ-আঞ্চলিকতাবাদ, বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর, ভারত মহাসাগর, শক্তি সহযোগিতা

● অনুবাদ : **গোলাম মুস্তাফা**

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ, অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাদের উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য এ কৌশলগুলোকে প্রবৃদ্ধির বাহন হিসেবে দেখছে। সহযোগিতার প্রধানতম চালক হিসেবে আবির্ভূত অর্থনৈতিক ইন্টিগ্রেশন বা অঙ্গীভূতকরণ এবং সংযোগ স্থাপনকে এখন আর সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে না। সংযোগ ও ট্রানজিট এখন সহযোগিতার নতুন প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক নীতিনির্ধারকদের কাছে বেশ সমাদৃত হলেও এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্রের দিকে অতটা দৃষ্টিপাত করেনি। যদিও পণ্য পরিবহনের খরচ এবং পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করলে জলপথ স্থলপথের চেয়ে অনেকটা সস্তা এবং পরিবেশবান্ধব। এ ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর ভারতসহ এ অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিবেচনার তুলনামূলক নতুন ক্ষেত্র। সরকারগুলোর মধ্যে প্রধান নীতি সহযোগিতা সম্পর্কিত যৌথ বিবৃতিগুলোয় উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার, সামুদ্রিক অর্থনীতি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয় স্থান করে নিচ্ছে।

এর থেকে এটা দৃশ্যমান হচ্ছে যে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলো মোকাবিলার জন্য সামুদ্রিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করছে। দ্য ইন্ডিয়ান ওশান রিম কান্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ) এবং বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল ইকোনমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) মতো সংস্থাগুলো যথাক্রমে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব তুলে ধরছে। ভারতের স্বাধীনতার পর বঙ্গোপসাগর বেশ গুরুত্ব পেলেও আন্দামান সাগর তার কাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব লাভ করেনি। আন্দামান সাগরকে বঙ্গোপসাগর এবং অতীতে ভারতের সঙ্গে জমজমাট বাণিজ্য সম্পর্ক থাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সংযোগকারী হিসেবেই দেখা হয়। আন্দামানে একটি ট্রাই-সার্ভিস কমান্ড স্থাপন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনী এই কমান্ডের দায়িত্বে আছে।

আন্দামান সাগর ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এবং ভারত মহাসাগরকে এটি 'ইন্দো প্যাসিফিক'-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ভূকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বর্তমানে আঞ্চলিক এবং চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ভারত মহাসাগরের এ অংশটি

এ অঞ্চলের অনেক রাষ্ট্রেরই জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। কারণ, এটি তাদের জ্বালানি পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ। ফলে কোনো রাষ্ট্রই এই সামুদ্রিক পথে কোনো কারণে বিঘ্ন সৃষ্টি হোক, তা চায় না। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে ভারত এ অঞ্চলটিকে 'জোন অব দ্য পিস' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব রেখেছিল, যাতে করে অঞ্চলটি পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের শিকার না হয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দুটি উপ-অঞ্চল হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগর, যদিও তাদের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত গুরুত্বের কারণে এ অঞ্চল দুটিকে একটি একক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা এবং আন্দামান সাগরের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। মে ২০১৮ সালে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনে সম্মত হয়। এই টাস্কফোর্সের লক্ষ্য হচ্ছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপগুলোর সঙ্গে সুমাত্রার যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। সুনীল এস অমৃত তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের ভূতপূর্ব গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ অতীত যদিও কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন :

ভাঙনের গতি বেশ প্রখর; কারণ আত্মীয়তা, বাণিজ্য বা সাংস্কৃতিক বন্ধনে বঙ্গোপসাগর সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকলেও এই সাগরকে ঘিরে একই ধরনের কোনো রাজনৈতিক কাঠামো কখনো ছিল না। এমনকি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাঠামোও বঙ্গোপসাগরকে একাঙ্গীভূত করতে পারেনি। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক একীভূতকরণের অর্থবহ একক হিসেবে বঙ্গোপসাগর কখনো আবির্ভূত হয়নি, যদিও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এশিয়ায় অনেকের কাছে এমনটাই মনে হয়েছিল (অমৃত, ২০১৩, পৃ. ৩)।

নিরাপত্তার ধারণার পুনর্মূল্যায়ন : সামরিক নিরাপত্তা থেকে নতুন নিরাপত্তার ধারণা

স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো অধিকতর গুরুত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোও বিস্তৃত হয়। সামরিক সংঘর্ষের ভয় থেকে উদ্ভূত প্রথাগত নিরাপত্তাঝুঁকিও লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। একই সঙ্গে শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিষয়ের মতো সমসাময়িক নিরাপত্তা ইস্যুগুলো বিশেষ নজর কেড়েছে। কারণ, এ বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক মানুষকে বাস্তুচ্যুত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জলদস্যুরা সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করেছে। কারণ, কোনো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে এই চ্যালেঞ্জগুলো একা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্যোগগ্রস্ত লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে বা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আন্তরাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও যৌথ অভিযানের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকে না। ভারত ও শ্রীলঙ্কা এমন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়েছে, যারা প্রাণঘাতী অস্ত্র পরিবহন এবং হামলা চালানোর জন্য সমুদ্রপথ ব্যবহার করত।

২০০০ সালের শুরুর দিকে এ অঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রই বঙ্গোপসাগরে তাদের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে তেল ও গ্যাস আবিষ্কার করেছে। সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পর এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা এখন সবারই লক্ষ্য। দ্য অয়েল অ্যান্ড নেচারাল গ্যাস করপোরেশন (ওএনজিসি) নিশ্চিত করেছে যে ২০১৯ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে তারা তাদের উৎপাদন চার গুণ করবে।[১] এই রাষ্ট্রগুলো এখন যৌথ অনুসন্ধান শুরু করতে এবং সম্পদ আহরণে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে আগ্রহী। অপ্রচলিত নিরাপত্তা ইস্যুগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক পরিবেশ, ওশান গভর্ন্যান্স, মানবিক সহায়তা এবং সমুদ্র ব্যবহার করে আন্তদেশীয় অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এ অঞ্চল টেকসই পদ্ধতিতে জ্বালানি ও সামুদ্রিক সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৃহত্তর আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগ করে দিয়েছে। ব্লু ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির ধারণা ওশান গভর্ন্যান্সের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা টেকসই পদ্ধতিতে সম্পদ অনুসন্ধানে সহায়তা করতে পারে। তবে সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগানোর জ্ঞান ও প্রযুক্তি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ের। আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরের সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর আগে ২০০৮ সালে মিয়ানমারের তেল অনুসন্ধানকাজের প্রতিবাদ হিসেবে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে তার নৌবাহিনী মোতায়েন করেছিল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেও নিউ মুর আইল্যান্ড (পূর্বাশা দ্বীপ) নিয়ে বিরোধ ছিল, যা এখন সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরেও তাদের সীমানা নিয়ে রাষ্ট্রগুলোর দাবিদাওয়া এই বিরোধগুলোর মূল কারণ ছিল। কারণ, প্রতিটি রাষ্ট্রই বিশ্বাস করত যে তাদের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে প্রচুর পরিমাণ তেল ও অন্যান্য সামুদ্রিক খনিজ দ্রব্য রয়েছে, যা আহরণ করা সম্ভব (আলম, ২০০৮)। ২০০৬ সালে বঙ্গোপসাগরে ভারতের তেল অনুসন্ধান নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপক ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

বঙ্গোপসাগরের আয়তন মোটামুটি ৬ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার। ইন্দো-চীন প্রতিযোগিতা বঙ্গোপসাগরকে সামুদ্রিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। সাধারণত এটাকে একীভূত অর্থনীতি বা কৌশলগত অঞ্চলের পরিবর্তে

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ভাগ করা উপ-অঞ্চল হিসেবে দেখা হতো। এই 'মানসিক মানচিত্র' বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দিয়েছিল। এ অঞ্চল যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে এবং সড়ক ও রেল দ্বারা সংযুক্ত হচ্ছে, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থে এর নিরাপত্তাকৌশলও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ভারতের আন্দামান ও নিকোবর কমান্ডের শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলটি ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্দামান সাগরে ভারতের সঙ্গে থাইল্যান্ডের সমুদ্রসীমা রয়েছে। চীনের সামুদ্রিক সিল্ক রুট নির্মাণের ঘোষণা এবং থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে গভীর প্রতিরক্ষা সহযোগিতা থাকায় বঙ্গোপসাগর ভারতের কৌশলগত বিবেচনার অংশে পরিণত হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এ দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপ্রচলিত নিরাপত্তা ইস্যুগুলোতে সহযোগিতা করছে। একই সঙ্গে ভারত তার সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে এবং এ অঞ্চলের নৌবাহিনীগুলোর সঙ্গে যৌথ মহড়াগুলোতে অংশগ্রহণ করছে, যা তাকে ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে এবং মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের মতো বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত করছে।

এ অঞ্চলের ভূকৌশলগত গুরুত্ব এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে জ্বালানি তেল পরিবহনের ৯০ শতাংশই এই পথ দিয়ে হয়। ভারত বঙ্গোপসাগরকে তার নিরাপত্তাকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি ভারতের নিরাপত্তাভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মিয়ানমারের কোকো দ্বীপে এর নৌ কর্মকাণ্ড এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে গতিতে এটি বন্দরে নিজের অবস্থান তৈরি করছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চীন এ অঞ্চলে তার উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে চায়। ১৯৬২ সালের ইন্দো-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি বঙ্গোপসাগরকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এর আগে এ অঞ্চলে অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল। এর মধ্যে কিছু কিছু অস্থিরতা চীন, ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সহায়তায় হয়েছে। তবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সহযোগিতার ফলে এসব নিরাপত্তা ইস্যুর সমাধান হয়েছে।

এ অঞ্চলে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দেখা গেছে এবং এখনো বঙ্গোপসাগর অবৈধ অস্ত্র বহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাও আন্তরাষ্ট্রীয়

সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের নাজুকতা তুলে ধরছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের পুলিশ ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার করে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ অঞ্চলটি পূর্ব এশিয়ার অবৈধ অস্ত্রের বাজারের নিকটবর্তী, যা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্রের একটি প্রধান উৎস। নিকট অতীতে এ অঞ্চলে লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এলটিটিই) সক্রিয় ছিল। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের সন্নিকটে হওয়ায় মাদক পাচারও এ অঞ্চলের একটি স্পর্শকাতর বিষয়। ফলে এ অঞ্চলে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ অঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রের গণতন্ত্রই এখনো বিকশিত হয়নি, যার কারণে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা এখানে এখনো নাজুক। তবে অর্থনৈতিক চাপের কারণে সহযোগিতা ক্রমে কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। এ অঞ্চলে ভারতের বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙা করবে এবং এ অঞ্চলের সঙ্গে সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্দরের সংযোগ ঘটাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতি ভারতের নীতির মূল স্তম্ভ হচ্ছে সাবেক লুক ইস্ট নীতি এবং সম্প্রতি ঘোষিত অ্যাক্ট ইস্ট নীতি।

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত যোগাযোগের একটি দৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে না পারলে ভারতের লুক ইস্ট নীতি কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে না। ভারতের লুক ইস্ট নীতির সামুদ্রিক দিকটি এড়িয়ে গেলে চলবে না। ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রগুলোর সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এই রাষ্ট্রগুলোর নির্মাণশৈলী এবং সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বেশ দৃশ্যমান। ওডিশা, বাংলা এবং অন্যান্য উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে নাবিকেরা ভারতীয় মসলা, কাপড় এবং মূল্যবান পাথর নিয়ে এসব অঞ্চলে বাণিজ্যে যেত। এই সামুদ্রিক বাণিজ্য একই সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতি, বিশেষত বৌদ্ধবাদকে ওই সব অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে শুধু সাংস্কৃতিক সংযোগই নয় একই সঙ্গে পুরোনো বাণিজ্য সংযোগগুলোর পুনর্জাগরণও ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড ব্রেস্টার তাঁর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান অনেক রাজ্যই 'সাংস্কৃতিকভাবে ইন্ডিয়ানাইজড বা ভারত প্রভাবিত' ছিল (ব্রেস্টার, ২০১৫)।

স্বাধীনতার পরপরই ভারত স্থল প্রতিরক্ষানির্ভর নিরাপত্তাকৌশল গ্রহণ করে। ফলে সেনাবাহিনী সর্বাধিক গুরুত্ব পায় এবং বঙ্গোপসাগর অনেকটাই অবহেলিত থাকে। এমনকি ভারত মহাসাগর থেকে রয়্যাল নেভি উঠিয়ে নেওয়ার পরও ভারত কৌশলগত শূন্যস্থান পূরণের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তবে ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে ভারত সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের ভারত মহাসাগরে যাত্রা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে

নৌবাহিনীর গুরুত্বকে আলোচনায় নিয়ে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন থেকেই পূর্বাঞ্চল রক্ষা করার জন্য ভারত আন্দামান ও নিকোবর কমান্ড গড়ে তোলে। এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব এবং বঙ্গোপসাগরে অনুপ্রবেশের কৌশলগত গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। বঙ্গোপসাগর এবং চিকেন নেক হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডর ভারতকে চীনের হুমকির মুখে আরও নাজুক করে তুলবে। কোকো দ্বীপে চীনের উপস্থিতি এবং মিয়ানমারে নৌবন্দর, বিমানবন্দর এবং জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের কারণে এ অঞ্চল আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে চীন কিয়কপিয়ু গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছে। এ বন্দরে চীনের ৭০ শতাংশ হিস্যা রয়েছে এবং এটি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি অংশ। সীমানাগত কৌশলের অংশ হিসেবে চীন তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোকে নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। ইতিমধ্যে চীন ইউনান প্রদেশের কুনমিং পর্যন্ত ৮৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

তবে চীনের বঙ্গোপসাগরে উপস্থিতির উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক চলমান আছে। অতীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, চীন কোকো দ্বীপে যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে চীন তার উপস্থিতিকে জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বলেই প্রচার করে। ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং স্থলপরিবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রপ্তানি উন্মুক্তকরণের ভিত্তিতে ভারতের কার্যকর লুক ইস্ট নীতির কৌশলগত মূল্য রয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বলতে গিয়ে তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব শিবশংকর মেনন বলেন, 'আমাদের লুক ইস্ট নীতিতে আমরা চাই আমাদের প্রতিবেশী ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য যাত্রার কারণে যে সুযোগগুলো তৈরি হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে' (মিনিস্ট্রি অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স, ২০১২)।

২০০৫ সালে কুয়ালালামপুরে আসিয়ান বিজনেস অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সভার তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কৌশলগত মাপকাঠিগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা শুধু একটি বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি নয়, এটি ভারতের বিশ্বদর্শন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থানের একটি কৌশলগত পরিবর্তন। অধিকন্তু এটি দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় আমাদের সভ্যতাগত প্রতিবেশীদের কাছাকাছি পৌঁছানো। আমি সব সময় ভারতের ভবিষ্যৎকে এশিয়ার এবং তার চেয়েও বেশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যতের সঙ্গে আন্তসম্পর্কিত হিসেবেই দেখি। (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ২০০৫)।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী তিনটি রাষ্ট্র—বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার তাদের মধ্যকার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এরও আগে ভারত ও শ্রীলঙ্কা তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার মতো একটি ভিত্তি তৈরি হলেও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগানো এবং নিরাপত্তা ইস্যুগুলো মোকাবিলার কোনো সমন্বিত কাঠামো হাতে নেই। সম্প্রতি চীন কর্তৃক বাংলাদেশকে সাবমেরিন সরবরাহ করা নিয়ে নয়াদিল্লির চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। এটা এ কারণে যে এর মাধ্যমে যখন চীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সাবমেরিন পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিতে আসবে, তখন তারা ভবিষ্যৎ সাবমেরিন চলাচলের জন্য বঙ্গোপসাগরের তলদেশের মানচিত্র তৈরি করে নিয়ে যেতে পারে। বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক জলপথ রয়েছে, যা মালাক্কা প্রণালির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে এ অঞ্চলে চীনের স্বার্থকে খাটো করে দেখা যাবে না। ইতিমধ্যে মিয়ানমারের মাধ্যমে চীন বঙ্গোপসাগরে তার প্রবেশ নিশ্চিত করেছে।

বঙ্গোপসাগরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে এটি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি প্রধানতম উৎস। ২০১৩ সালে মিয়ানমার মোট ১৩টি আন্তর্জাতিক ফার্মকে ১০টি অগভীর এবং ১০টি গভীর পানির ব্লক অনুসন্ধানের কার্যাদেশ দেয়। ভারতে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিকে কৃষ্ণা-গোদাভরি অববাহিকা গ্যাস ব্লক অনুসন্ধানের কাজ দেওয়া হয়েছে। ওএনজিসি বঙ্গোপসাগরে কেজি-ডিডব্লিউএন-৯৮/২ ব্লক অনুসন্ধান করছে, যেখানে তারা প্রতিদিন ১৫ মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার গ্যাস এবং ৭৭,০০০ ব্যারেল তেল উত্তোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে (সুন্দরাই এবং চক্রবর্তী, ২০১৮)। একইভাবে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জোনেও গ্যাস ব্লকের সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে মোট ব্লকের সংখ্যা ১৮ (সিদ্দিকী, ২০১৮)।

বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলো নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যকার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এ অঞ্চলের জন্য চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রথমত, এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর জ্বালানিনির্ভরতা; দ্বিতীয়ত, বঙ্গোপসাগরে জ্বালানি উৎসের অনুসন্ধান; তৃতীয়ত, সুনীল অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং সামুদ্রিক সম্পদের যৌথ অনুসন্ধান এবং চতুর্থত, যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, যা এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে একই সুতায় বাঁধবে। ভারত দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয়ভাবে এ অঞ্চলে তার স্বার্থ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করছে। এ অঞ্চলের কয়েকটি রাষ্ট্র যখন বিমসটেক গঠনের উদ্যোগ নেয়, ভারত তখন সানন্দে তাতে যোগ দেয়।

অপ্রচলিত নিরাপত্তা ইস্যুগুলোতেও এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য হচ্ছে। যে বিষয়গুলোতে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো

সহযোগিতা করছে, তা পরে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো। এ বিষয়গুলোর অর্থনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তা ভারত এবং বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলের জন্য পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে পারে।

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা

এ অঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই জ্বালানি চাহিদা ক্রমবর্ধমান এবং জ্বালানি চাহিদার জন্য রাষ্ট্রগুলো পার্সিয়ান গালফের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রগুলো জ্বালানি খাতে সহযোগিতায় একমত হয়েছে এবং দ্বিপক্ষীয়, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করছে। সম্প্রতি ভোলাসহ বাংলাদেশে মোট ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ভারত থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে এবং নেপাল ও ভুটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির প্রস্তাব করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভুটানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০৩০ সালের শেষ নাগাদ প্রয়োজনীয় ৩৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ সরকার গ্যাসের পরিবর্তে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পাওয়ার সেলের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সাল নাগাদ তা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে (পাওয়ার সেল, ২০১৭)।

ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল ত্রিপক্ষীয় জ্বালানি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজে ভারত তার বিদ্যমান লাইন ও গ্রিড ব্যবহার করতে দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে (সুবেদী, ২০১৮)। নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে দ্য ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন অব ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মধ্যে একটি চুক্তি এবং নেপাল ও ভারতের মধ্যেও একই রকম একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত রামপালে কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে সম্মত হয়েছে।

মহেশখালীতে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন ও কোরিয়ার সঙ্গে মোট পাঁচটি যৌথ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যার আনুমানিক উৎপাদনক্ষমতা হবে ৬,১২০ মেগাওয়াট (পাওয়ার সেল, ২০১৮)। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি মেঘনাঘাটে এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। কুতুবদিয়ায় প্রায় ৯৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় কোম্পানি পেট্রোনেট বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস অ্যান্ড মিনারেল করপোরেশনের সঙ্গে সমঝোতা

স্মারক স্বাক্ষর করেছে। আদানি পাওয়ার লিমিটেড ঝাড়খন্ডে অবস্থিত তাদের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে ১,৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ভারত ত্রিপুরার পালাটানা প্রকল্প থেকে অতিরিক্ত ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশকে সরবরাহের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। ভেড়ামারা-বহরমপুর গ্রিড দিয়ে ভারত বাংলাদেশে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি করছে।

বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় গ্যাস পাইপলাইন করার উদ্যোগ ২০০৫ সালে ভেস্তে গেলেও ভারত মিয়ানমারে প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের বিষয়ে বেশ আগ্রহী। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে এখন চীন এককভাবে মিয়ানমারে গ্যাস অনুসন্ধান করছে। ২০১৪ সালে ওএনজিসি ভিদেশ লিমিটেড এবং গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড এ১ এবং এ৩ ব্লকে অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং বি২ ও ইপি৩ ব্লকগুলোও ভারতকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য হাইড্রোকার্বন ভিশন ২০৩০ প্রকাশ করেছেন, যেখানে জ্বালানি পরিবহনের ক্ষেত্রে আন্তসীমান্ত সহযোগিতার আভাস রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চাহিদা পূরণের পর ভারত তার হাইড্রোকার্বন সম্পদ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছে রপ্তানি করতে চায়। নিচের টেবিলে এ অঞ্চলের চাহিদা-জোগানের চিত্র তুলে ধরা হলো :

টেবিল ১ : দক্ষিণ এশিয়ায় হাইড্রোকার্বন সম্পদের চাহিদা-জোগানের চিত্র

	২০১৪-১৫	২০১৯-২০	২০২৪-২৫	২০২৯-৩০
প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় চাহিদা সম্ভাবনা				
মিয়ানমার	২.০০	১.১৫	১.০০	০.৭৫
বাংলাদেশ	৪.০০	৪.০০	৩.৬০	৫.৪০
নেপাল	১.৪০	১.৭০	২.০৭	২.৫২
ভুটান	০.১০	০.১২	০.১৫	০.১৮
শ্রীলঙ্কা	২.০০	১.১৫	২.৫০	৩.৫০
পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্টের মোট সম্ভাব্য চাহিদা	৯.৫০	৮.৩৭	৯.৩২	১২.৩৫
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সরবরাহের সম্ভাবনা				
উৎপাদন সক্ষমতা	৬.৫	৭.০	১৪.৩	১৪.৩
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চাহিদা	৩.২০	৪.০	৫.৪	৭.৩
উদ্বৃত্ত	৩.৩	৩.০	৮.৯	৭.০

উৎস : ক্রিসিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাডভাইজরি (পিআইবি, ২০১৬, পৃ. ১৯৩)

বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড পারস্পরিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে, যা বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এ রাষ্ট্রগুলোকে আরও সংযুক্ত করবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একাধিক বহুমাত্রিক যোগাযোগ প্রকল্প চলমান আছে। দুই সরকারেরই লক্ষ্য হচ্ছে যোগাযোগব্যবস্থাকে দেশভাগের আগের চিত্রে নিয়ে যাওয়া এবং বর্তমান চাহিদামাফিক আরও সম্প্রসারণ করা। ভারত ভাগের আগে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বাংলাদেশ সড়ক, রেল এবং বন্দর ব্যবহারের দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে একটি অঞ্চলই ছিল। ১৯৬৫ সালের ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই সংযোগ অব্যাহত ছিল। দেশভাগের পর রাষ্ট্রগুলো অন্তর্মুখী হয়ে যায়। দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে এ দেশগুলো বেশি জোর দেওয়া শুরু করে। ২০০০ সালের পরই এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। দীর্ঘমেয়াদি আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক রাজনৈতিক পার্থক্য ও বিশ্বাসহীনতা দূর হতে শুরু করে।

ভারত ও মিয়ানমার বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা করছে। ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ভারতের সহায়তার কারণে সামরিক শাসকদের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে মিয়ানমার ১৯৯৩ সালে প্রণীত লুক ইস্ট নীতির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। তখন থেকে রাষ্ট্র দুটি কালাদান মাল্টিমডেল প্রকল্পে একমত হয়, যা দীর্ঘ সময় পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে শেষ হতে যাচ্ছে। মিয়ানমার, ভারত ও থাইল্যান্ড ত্রিপক্ষীয় মহাসড়ক নির্মাণ করছে, যার মাধ্যমে ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আসিয়ান রাষ্ট্রগুলোয় প্রবেশাধিকার পাবে। ভারত আসিয়ান রাষ্ট্রগুলোয় ভৌত ও ডিজিটাল যোগাযোগ তৈরির জন্য ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রস্তাব করেছে এবং কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার ও ভিয়েতনামে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব স্থাপনের জন্য ৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নয়ন তহবিলের পরিকল্পনা করছে (বালসুব্রামানিয়াম, ২০১৫)। তবে নয়াদিল্লিকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে পরিণত করতে হবে। কারণ, ঘোষণার তিন বছর পরও এ অর্থ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

ভারতের তামিলনাড়ুর ধানুশকোডি এবং শ্রীলঙ্কার থালাইমানার মধ্যে ফেরি যোগাযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ২০১১ সালে টুটিকোরিন এবং কলম্বোর মধ্যে ফেরি যোগাযোগ শুরু হয়। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রস্তাবিত হাইভোল্টেজ ডিরেক্ট কারেন্ট গ্রিড ইন্টারকানেকশন প্রকল্প মাদুরাইকে অনুরাধাপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে দুই দেশের সরকার 'গিগাবাইট কানেকটিভিটি' প্রকল্পের উদ্বোধন করে। দুই দেশের মধ্যে সেতু বা সমুদ্রের নিচে টানেল নির্মাণে অর্থায়ন করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক রাজি আছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কা জাপানের সঙ্গে

যৌথভাবে ট্রাইকোমালি আপার অয়েল ট্যাংক ফার্ম স্থাপন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানির সঙ্গে লঙ্কা অয়েলের একটি যৌথ উদ্যোগ রয়েছে এবং এটি ইতিমধ্যে ট্রাইকোমাল স্থানে লোয়ার ট্যাংক পরিচালনা করছে। ভারত কলম্বো/কেরাওয়ালাপিটিয়ায় একটি ৫০০ মেগাওয়াট এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং একটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করছে। দুই দেশ সমুদ্রের নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়েও আলোচনা করছে।

ভুটানে ভারতের একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আছে। ভারত ও ভুটান ২,১২০ মেগাওয়াটের চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে একমত হয়েছে: খোলংচু, বুনাখা, ওয়াংচু ও চামখারচু। দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশের দেশগুলো পারস্পরিক গ্রিড সংযোগের কাজ করছে, যার ফলে তারা তাদের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ তাদের প্রতিবেশীদের কাছে রপ্তানি করতে পারে। নেপাল ও বাংলাদেশ জ্বালানি সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ভারত ৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মতিহারি-আমলেখগঞ্জ তেল পাইপলাইনের ১৭ কিলোমিটার নির্মাণ শেষ করছে, যা দিয়ে নেপালকে ২ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাবে। আন্তদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেপাল ও ভুটানের জন্য ভারত একটি প্রধানতম ট্রানজিট হিসেবে রয়েছে। ২০১৬ সালে ভারত আন্তদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্য নীতিমালা তৈরি করেছে (জ্বালানি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ২০১৬)।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বঙ্গোপসাগরে উপকূলীয় সংযোগ

বঙ্গোপসাগরকে একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে যথাযথভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে শুধু মুক্ত বাণিজ্য এবং আন্তসীমান্ত সংযোগ নিশ্চিত করলেই হবে না, একই সঙ্গে নিরাপত্তা ইস্যু এবং বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার দিকেও নজর দিতে হবে। বর্তমানে কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা সহযোগিতা কৌশল চলমান আছে, যেমন ভারত ও মিয়ানমার সপ্তম ভারত-মিয়ানমারের সমন্বিত পেট্রোল (করপাট), ভারত ও বাংলাদেশ প্রথম যৌথ নৌ পেট্রোল ইত্যাদি। ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং মিয়ানমারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে এর প্রবেশের কারণে ভারত সমুদ্রের তলদেশের কর্মকাণ্ড মনিটর করার জন্য সেন্সর বসানোর পরিকল্পনা করছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রাখাইন প্রদেশ এবং দাউইতে মিয়ানমার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। রাখাইন প্রদেশে চলমান সহিংসতার কারণে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক অপরাধের শিকার হতে পারে।

একইভাবে বাংলাদেশ তার বৈশ্বিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করছে এবং মাদক ও অস্ত্র পাচারের বিষয়টি বিবেচনা করে দেশটি তার নৌশক্তি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছে। গভীর সমুদ্রে পাচারকারীদের নজরে রাখতে দেশটি ইতিমধ্যে দুটি গভীর সমুদ্রে চলাচল উপযোগী জলজান নির্মাণের কার্যাদেশ দিয়েছে। ভারত ও থাইল্যান্ড সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতা করছে। ভারত ও থাইল্যান্ডের নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমানায় বছরে দুবার যৌথ সামরিক মহড়া করছে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়াও একই ধরনের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জোনগুলো জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও গভীর সমুদ্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ-কাঠামো নেই। ফলে সেখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর সহযোগিতা প্রয়োজন।

এ অঞ্চলে জলদস্যুসহ অস্ত্র, মাদক ও আদম পাচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। কয়েকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যে এসব সমস্যা সমাধানে দ্বিপক্ষীয়ভাবে কাজ করছে। ভারতের সঙ্গে নেপালের বার্ষিক নিরাপত্তা ডায়ালগ, ভুটানের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বার্ষিক প্রতিরক্ষা ডায়ালগ বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর সীমান্তে অসংখ্য মানুষ বসবাস করে এবং এ অঞ্চলে আন্তসীমান্ত নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রায়ই সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সীমান্ত অতিক্রম করে এবং অপর পারে তাদের জ্ঞাতিদের সাহায্য গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলো পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়। একই সঙ্গে নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিরাপত্তা ইস্যুগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্ক ও বিমসটেকের সন্ত্রাসবাদবিরোধী চুক্তিগুলো রাষ্ট্রগুলোকে যৌথভাবে কাজ করার বহুপক্ষীয় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এলটিটিইর তৈরি করা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারত ও শ্রীলঙ্কা নিবিড়ভাবে কাজ করছে, যারা অস্ত্র সরবরাহের কাজে ভারত মহাসাগর ব্যবহার এবং এ অস্ত্র দিয়ে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করত। একই সঙ্গে ভারত বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে গভীর সাগরে নজরদারির উপযোগী জলযান সরবরাহ করেছে। নিরাপত্তার বিষয়ে সমন্বয় করার জন্য বিমসটেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলো প্রথমবারের মতো উপদেষ্টা পর্যায়ে সংলাপের আয়োজন করেছে। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অনেক দ্বিপক্ষীয় মতানৈক্য রয়েছে, তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

সামুদ্রিক অঞ্চলসম্পর্কিত সচেতনতা

সমুদ্র অঞ্চল সম্পর্কে সচেতনতা বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলের

রাষ্ট্রগুলোর সামুদ্রিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মহাসাগর সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করতে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদান, আন্তদেশীয় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান এবং উপকূলীয় রাডারব্যবস্থা স্থাপন এর অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রে শাসন প্রতিষ্ঠা ও নৌবাহিনীগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও জরুরি। এ ক্ষেত্রে হোয়াইট শিপিং চুক্তির মতো সহযোগিতা কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং হাইড্রোগ্রাফিক্যাল তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তথ্য সরবরাহ সেন্টার স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রগুলো ইতিমধ্যে দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় নৌমহড়া সম্পন্ন করেছে।

ভারতের উপকূলীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দ্য ন্যাশনাল কমান্ড কন্ট্রোল কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে, যার কাজ হচ্ছে সব জাহাজ, মাছ ধরার নৌকা এবং উপকূলের নিকটবর্তী চলাচল করা অন্যান্য জলযান সম্পর্কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি এবং রাডার চেইনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। ভারত বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে ফিউশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে এসব তথ্য আদান-প্রদান করতে উৎসাহী।

নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ : বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংগঠন

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলে একাধিক আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো রয়েছে। যেকোনো বর্ধনশীল অঞ্চলের সাফল্যের জন্য এ ধরনের আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কর্মকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপালের সমন্বয়ে বিবিআইএন নামে একটি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো রয়েছে। বিদ্যমান আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে বিমসটেক। বিসমটেকভুক্ত অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। বিমসটেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মোট জনসংখ্যা ১.৫ বিলিয়ন, যা বিশ্ব জনসংখ্যার ২১ শতাংশ এবং তাদের সমন্বিত জিডিপির পরিমাণ ২.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। একটি গবেষণামতে, যদি যথাযথ রেল ও সড়ক যোগাযোগ থাকত, তবে সমুদ্রপথে এবং রেলপথে বাণিজ্য আড়াই গুণ এবং সড়কপথে বাণিজ্য ছয় গুণ বৃদ্ধি পেত (ডি উইগনাল অ্যান্ড উইগনাল, ২০১৪, পৃ. ৫)।

কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত বিমসটেকের চতুর্থ সম্মেলনে সদস্যরাষ্ট্রগুলো আন্তদেশীয় বিদ্যুৎ গ্রিড স্থাপনের বিষয়ে একমত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কারণ দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে গ্রিড সংযোগ বর্তমানে চালু আছে (পাটানায়েক, ২০১৮)। বিমসটেক সুনীল অর্থনীতির ওপর জোর দিচ্ছে। তবে সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং সমুদ্রদূষণরোধে রাষ্ট্রগুলোকে

তাদের নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সামুদ্রিক বাহিনীগুলো পরিচালনায় নিয়মনীতি প্রণয়ন, বহুপক্ষীয় সংলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং গবেষণা ও উন্নয়নসম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা জোট গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে। সামুদ্রিক সহযোগিতার কৌশলগত সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সহযোগিতার জন্য বিমসটেক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমন্বিত এবং সরলীকৃত ট্রানজিট-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে বিমসটেক তার সদস্যদের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। বিমসটেক কাঠামোর বাইরে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো এশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ে নেটওয়ার্কেরও অনুস্বাক্ষরকারী।

বিমসটেকের বাইরে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থা হচ্ছে সার্ক ও আসিয়ান। আসিয়ানকে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সফল উদাহরণ হিসেবে দেখা হলেও ভারত ও পাকিস্তানের অসহযোগিতার কারণে সার্ক পিছিয়ে পড়েছে। ভারত আসিয়ানের সংলাপ সদস্য এবং আসিয়ানের সদস্যরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা রয়েছে।

বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলের আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস) এবং আইওআরএ। আইওএনএসের আওতায় ৩৬টি উপকূলবর্তী রাষ্ট্র সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়গুলোতে সহায়তা করে। আইওআরএ নিয়মিতভাবে ভারত মহাসাগরীয় সংলাপ আয়োজন করে।

উপসংহার

এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালির নিকটবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চলটি বহিঃশক্তিগুলোর হস্তক্ষেপের মুখে রয়েছে। তবে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো বলিষ্ঠ যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন করতে চায় এবং তাদের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট স্বার্থ রক্ষায় দ্বিপক্ষীয়, উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক কৌশল ব্যবহার করছে। তেল আমদানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা এখনো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনাও এখানে পর্যাপ্ত। তবে এ সহযোগিতার পথে কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কিছু কিছু সংযোগ প্রকল্প পিছিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সমুদ্র অঞ্চলে সব রাষ্ট্রের সামর্থ্যও একই ধরনের নয়। তবে সহযোগিতার

প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে রাজনৈতিক মহল একমত। নীতি তৈরি এবং বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

পরস্পর সংযুক্তির ক্ষেত্রে উদীয়মান অঞ্চলগুলো গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য অনেক দিন ধরে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রতিবেশী দেশের নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাইছে। ভারত মহাসাগরে যেকোনো বহিঃশক্তির প্রবেশকে ভারত ঈর্ষার চোখে দেখবে। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো একটি একই ধরনের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। এই সংযুক্ত অর্থনীতিই নিরাপত্তা ইস্যুতে তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ধারণ করে দেবে।

বি.দ্র. : অনুবাদ ঈষৎ সংক্ষেপিত।

টীকা

১. ঘোষের বরাত দিয়ে জানা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানি দাইউয়ে বঙ্গোপসাগরের ব্লক ডি-১২ বাংলাদেশ অংশে একটি প্রাকৃতিক গ্যাসকূপ আবিষ্কার করেছে। এটা মিয়ানমারের ব্লক এডি-৭-এর লাগোয়া।

গ্রন্থপঞ্জি

Alam, K. (2008, August 2). Maritime boundary dispute and oil and gas exploration in the Bay of the Bengal. *Daily Star*. Retrieved from https ://www.thedailystar.net/newsdetail-48489

Amrith, S. S. (2013). *Crossing the Bay of Bengal : The furies of nature and the fortunes of migrants*. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Asia Pacific Energy Forum & UNESCAP. (2018). *Integrating South Asia's power grid for a sustainable and low carbon future, cross-border electricity cooperation in South Asia*. Retrieved from

https ://www.unescap.org/sites/default/files/Integrating%20South%20Asia%E2%80%99s%20Power%20Grid%20for%20a%20Sustainable%20and%20Low%20Carbon%20Future_WEB.pdf

Balsubramanian, J. (2015, November 21). PM Modi proposes $1 billion line of credit for connectivity with ASEAN. Live Mint. Retrieved from https ://www.livemint.com/Politics/riD4W4GN503dmSAGwBtZQN/PM-Modi-proposes-1-billion-line-of-creditfor-connectivity.html

Brewster, D. (2014). Dividing lines : Evolving mental maps of the Bay of Bengal. *Asian Security*, 10(2), 151-167. Retrieved from https ://core.ac.uk/

download/pdf/156624784.pdf

———. (2015). The rise of the Bengal tigers : The growing strategic importance of the Bay of Bengal. *Journal of Defence Studies*, 9(2), 81-104.

Dhaka Tribune. (2018, September 10). India begins 500MW additional power supply to Bangladesh. Retrieved from https ://www.dhakatribune.com/bangladesh/powerenergy/2018/09/10/india-begins-500mw-additional-power-supply-to-bangladesh

Emont, J., & Myo, M. (2008, August 15). Chinese-funded port gives Myanmar a sinking feeling. *The Wall Street Journal*. Retrieved from https ://www.wsj.com/articles/chinesefunded-port-gives-myanmar-a-sinking-feeling-1534325404

Ghosh, S. (2018, August 30). After India, Bangladesh discovers natural gas in the Bay of Bengal. *Indo Asian Commodity*. Retrieved from https ://www.indoasiancommodities.com/2018/08/30/india-bangladesh-discovers-gas-bay-bengal/

Indian Navy. *Initiatives to strengthen coastal security*. Retrieved from https ://indiannavy.nic.in/content/initiatives-strengthen-coastal-security

———. (2015). *Ensuring secure seas : India's maritime security strategy 2015* (p. iv). New Delhi : Integrated Head Quarter of Ministry of Defence.

Indian Ocean Rim Association (IORA) (n.d.). *Maritime Safety & Security*. Retrieved from http ://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/maritime-safety-and-security

———. (n.d.) *Disaster risk management*. Retrieved from http ://www.iora.int/en/prioritiesfocus-areas/disaster-risk-management

LNG World News. (n.d.). *Petronet to build $950 mln LNG terminal in Bangladesh*. Retrieved from https ://www.lngworldnews.com/petronet-to-build-950-mln-lngterminal-in-bangladesh/

Ministry of External Affairs (MEA). (2014). *Brief on BIMSTEC*. Retrieved from https ://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/BIMSTEC_Brief_February_2014.pdf

———. (2018, February 18). *Speech by Foreign secretary on India's look East policy at the 10th meeting of the BCIM (Bangladesh, China, India, Myanmar) Cooperation Forum*. Retrieved from https ://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/18855/

Ministry of Power, Government of India. (2016, December). *Guidelines of*

cross border trade in electricity. Retrieved from https ://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Guidelines% 20for%20Cross%20Boarder%20Trade.pdf

Patnaik, S. K. (2015, November). Odisha and South-East Asia a study of ancient relations and maritime heritage. *Odisha Review*, pp. 30-35. Retrieved from http ://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2015/Nov/engpdf/26-37.pdf

Pattanaik, S. S. (2016). Indian Ocean in the emerging geo-strategic context : Examining India's relations with its maritime South Asian neighbors. *Journal of Indian Ocean Region*, 12(2), 127-128.

———. (2018). Transforming Eastern South Asia : Relevance of BIMSTEC. *Strategic Analysis*, 42(4), 422-429.

Power Cell (2018). Coal fired big projects. Retrieved from http ://www.powercell.gov.bd/site/page/e35bd93a-c1ba-45b3-b7c2-21a0e035df30/%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A7%8E-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA

———. (2017, March 29). *utpadan parikolpana (Power Generation)*. Retrieved from http ://www.powercell.gov.bd/site/page/4577f2b0-761b-4abe-8f00-37f129b50849/উৎপাদন-পরিকল্পনা

Press Information Bureau (PIB). (2005, December 12). *Keynote address at special leaders dialogue of ASEAN Business Advisory Council*. Retrieved from http ://pib.nic.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=14102

———. (2016, February 9). *Petroleum Minister releases Hydrocarbon Vision 2030 for North-East*. Retrieved from http ://pib.nic.in/newsite/printrelease.aspx?relid=136255

PTI. (2018, January 6). Swaraj's 3-C formula for ties with ASEAN : Culture, commerce, connectivity. *Business Standard*. Retrieved from https ://www.business-standard.com/article/current-affairs/swaraj-s-3-c-formula-for-ties-with-asean-culture-commerceconnectivity-118010600452_ 1.html

Rajya Sabha. (2018, March 15). *Question no 2252 on Trilateral Highway*. Retrieved from https ://mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/29652/question+no2252+trilateral+highway

Reuters. (2018, May 25). *India's ONGC to quadruple output from Bay of*

Bengal gas field that cost $1 bln. Retrieved from https ://www.reuters.com/article/ongc-gas/indias-ongcto-quadruple-output-from-bay-of-bengal-gas-field-that-cost-1-bln-idUSL3N1SV5AB

Royal Bhutanese Embassy. (2016). *New Delhi : Bhutan-India Hydropower Relations*. Retrieved from http ://www.mfa.gov.bt/rbedelhi/?page_id=28

Samaranayake, N. (2012). *The long littoral project—Bay of Bengal : A maritime perspective on Indo-Pacific security* (p. 17). CNA. Retrieved from https ://www.cna.org/cna_files/pdf/irp-2012-u-002319-final.pdf

Shin, A. (2016, February 15). Second gas column discovered in the Bay of Bengal. *Myanmar Times*. Retrieved from https ://www.mmtimes.com/business/18976-secondgas-column-discovered-in-the-bay-of-bengal.html

Siddiqui, S. (2018, August 18). Prospects of huge gas reserves in deep sea. *The Independent*. Retrieved from http ://m.theindependentbd.com/post/161330

Singh, S. (2018, April 4). Three years, no takers for India's $1-billion credit line for ASEAN digital links. *The Indian Express*. Retrieved from https ://indianexpress.com/article/india/three-years-no-takers-for-indias-1-billion-credit-line-for-asean-digitallinks-narerndra-modi-5122440/

Subedi, B. (2018, December 23). India relaxes cross-border power trading guidelines. *The Kathmandu Post*. Retrieved from http ://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-12-23/india-relaxes-cross-border-power-trading-guidelines.html

Sundaria, S., & Chakravarty, D. (2018, February 5). ONGC's biggest oil, gas project in Krishna-Godavari basin expected to be delayed. *Livemint*. Retrieved from https ://www.livemint.com/Industry/R8kLK0myZxL1cE7yGbjftJ/ONGCs-biggest-oil-gasproject-in-KrishnaGodavari-basin-ex.html

Swaine, M. D. (2013). *Chinese views and commentary on periphery diplomacy*. Stanford, CA : Hoover Institute. Retrieved from https ://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm44ms.pdf

The Himalayan Times. (2018, August 11). Nepal and Bangladesh ink MoU on energy cooperation. *The Himalayan Times*. Retrieved from https ://thehimalayantimes.com/business/nepal-bangladesh-ink-mou-on-energy-cooperation/

The Indian Express. (2018, January 23). India-Myanmar-Thailand trilateral highway by 2019 : Nitin Gadkari. *The Indian Express*. Retrieved from https ://www.livemint.com/Politics/hdV9E00I5CwSrKmSheAu6M/IndiaMyanmarThailand-Trilateral-Highwayby- 2019-Nitin-Gad.html

USGS. (2016, July 25). *Large deposits of potentially producible gas hydrate found in Indian Ocean*. Retrieved from https ://www.usgs.gov/news/large-deposits-potentiallyproducible-gas-hydrate-found-indian-ocean

Wignall, D., & Wignall, M. (2014). *Seaborne trade between South Asia and South east Asia* (ADB Study Working Paper No. 508). Tokyo : ADB.

রাজনীতি

কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ : স্বরূপ অন্বেষণ

আলেকজান্ডার লিবম্যান ও আনাসতেসিয়া ভি. অবিডেঙ্কোভা

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কীভাবে গণতন্ত্রায়ণপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে, তা গবেষকদের জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় বিষয়। আঞ্চলিক সংস্থাগুলো বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রণোদনা তৈরি করতে পারে, যেমন সদস্যপদ ও অর্থসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে (ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে সেন্ট্রাল ইউরোপে যেমনটি করেছিল); অগণতান্ত্রিক সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে বরখাস্তের হুমকি প্রদান করে (অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস যেমন করেছে); এমনকি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে (ইকনোমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস যে পন্থার আশ্রয় নিয়েছে)। গণতন্ত্রায়ণপ্রক্রিয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলো যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে আঞ্চলিক সংস্থাগুলো একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। তবে আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর প্রভাব-সম্পর্কিত বিদ্যমান তাত্ত্বিক আলোচনা কেবল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত (যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ)। কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো (যেমন, যুক্তরাষ্ট্র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত সংস্থাগুলোর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

অথচ আঞ্চলিকতাবাদের আরেকটি রূপ ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত। তা হলো কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ। এই আঞ্চলিকতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা রূপে থাকে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোই।[১] প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে, যেগুলো অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিংবা প্রধানত অগণতান্ত্রিক

● অনুবাদ : **রাশেদ রাহম**

রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালে চীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনে (এসসিও) কেবল কিরগিজস্তান ও নতুন সদস্য ভারত ২০১৭ সালে এই জোটভুক্ত হয়েছে। নতুন এই দুই সদস্য ছাড়া এই সংস্থার সব সদস্যরাষ্ট্র একনায়কশাসিত। আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর এই উপদল গঠনের প্রবণতা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাগুলো তাদের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়। তবে তারা বিভিন্ন উপায়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনকে স্থিতাবস্থা দিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

দশকের পর দশক ধরে গবেষক ও মাঠকর্মীরা কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের ব্যাপারে সামান্যই নজর দিয়েছেন। এর দুটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, আঞ্চলিকতাবাদের প্রথাগত ভূমিকা (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পুঁজির অবাধ চলাচলের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া) বিবেচনা করলে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর তুলনায় কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সফলতা নামমাত্র।[২] দ্বিতীয়ত, প্রথাগত আঞ্চলিকতাবাদ, যেখানে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সমুন্নত রাখার জন্য গণতান্ত্রিক সদস্যরাষ্ট্রগুলোর বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে, সেখানে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর জন্য এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়াই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।[৩]

তবে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ প্রসঙ্গে এসব যুক্তি উত্থাপন করতে গিয়ে যে ব্যাপারটি আড়ালে চলে যায়, তা হলো, এই প্রবণতা ভিন্ন একধরনের আঞ্চলিক সংগঠনের উদ্ভবের কথা বলে, যা বিশ্বরাজনীতির জন্য ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। শক্তিশালী একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সৃষ্ট আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর চেয়ে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রায়ই ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব লক্ষ্য পূরণের জন্য এই সংস্থাগুলো যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করে, তার মধ্যে রয়েছে তুলনামূলক ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের অনুকূলে সম্পদের পুনর্বণ্টন ও বৈধতা প্রদান। এর মাধ্যমে তারা এসব দুর্বল রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা অসন্তোষ এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নটবরদের (actors) চোখরাঙানি থেকে সুরক্ষা পেতে সাহায্য করে।

কেন কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে? অনুমান করা যায়, শক্তিশালী একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মাধ্যমেই দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে সরাসরি সম্পদ সরবরাহ করতে পারে। তাহলে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের সুনির্দিষ্ট লাভালাভটা কী? কয়েক দশকজুড়ে পণ্ডিতেরা এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অভিন্ন নকশা ও কর্মপরিধি নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর বিস্তার যতটা না অংশগ্রহণকারী

দেশগুলোর সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যৌক্তিক কৌশল, তার চেয়ে বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রভাবেরই প্রতিফলন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাফল্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি, সমৃদ্ধি ও শান্তির ধারা হিসেবে আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর একটি শক্তিশালী ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। ফলে, বহুসংখ্যক রাষ্ট্র এই 'গ্লোবাল স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করেছে'[৪] এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুকরণে আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তুলেছে।

একনায়কশাসিত রাষ্ট্রগুলোর জন্য 'আঞ্চলিকতাবাদ' ধারণার তাৎপর্য হলো, একটি আঞ্চলিক সংস্থার কাঠামোর মধ্যে ফেলতে পারলে সমভাবাপন্ন রেজিমগুলোকে সমর্থন দেওয়ার জন্য তাদের উদ্যোগগুলো বাড়তি বৈধতা লাভ করে। স্বৈরশাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ আঞ্চলিক সংস্থাই এমন কার্যপ্রণালি অনুসরণ করে, যা একটি মান্যতত্ত্বের প্রতিফলন। এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক একীভূতকরণ (economic integration) নীতির (প্রধানত ইইউর বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত) সমর্থক এবং এটা স্বৈরতন্ত্রীদের সংঘকে প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত করে।

যা হোক, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ছদ্মাবরণে সেখানে আসলে বন্ধুভাবাপন্ন স্বৈরতান্ত্রিক রেজিমগুলোকে সহায়তা করাটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বিধিবিধানে যেমন 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে'র নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তেমনি আঞ্চলিক সংস্থাগুলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোকে বৈধতা দিতে সাহায্য করে।[৫] মোদ্দাকথা হলো, কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং নীতি-প্রভাব (phenomenon) সহকারে আঞ্চলিকতাবাদ থেকে স্বতন্ত্র প্রপঞ্চ হিসেবে খুব কমই স্বীকার করা হয় এবং এভাবে তা কর্তৃত্ববাদী রেজিমগুলোর সুবিধার্থে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত, যেসব রাষ্ট্র এসব প্রকল্প চালু করে, সেখানে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে প্রায়ই নিজেদের উচ্চমর্যাদা ও বৈশ্বিক শক্তিমত্তার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকে (২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রায়ই বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেদের মর্যাদার পরাকাষ্ঠা হিসেবে দেখানো হয়। কল্পিতভাবে উপস্থাপন করা হয় যে এমন একটি 'বৈশ্বিক ভারসাম্যাবস্থা' অর্জিত হয়েছে, যেখানে 'গ্র্যান্ড ইউরেশিয়া হলো একুশ শতকে বৈশ্বিক রাজনীতির একটি মেরুদণ্ড।'[৬] এই অনুমান রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক উৎপাদিত এবং সরকারি প্রচারযন্ত্র কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি মৌলিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে পৃথিবী আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধরত বিবদমান ব্লকে বিভক্ত। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি শক্তি

কর্তৃক কোনো দেশের প্রভাববলয় সংকোচনের প্রচেষ্টা থেকে সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা রূপায়ণের বৈশ্বিক যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে নিজস্ব আঞ্চলিক সংগঠন প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৮৮০-এর দশকে বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করার উপায় হিসেবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যে যুক্তিতে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই একই যুক্তি ২০১০-এর দশকে স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোকে আঞ্চলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করে। ফলস্বরূপ, 'বিশ্বে নিজেদের ন্যায্য স্থান' অধিকার (কিংবা পুনরুদ্ধার) করার রূপকল্পে সম্মোহিত জনগণের কাছ থেকে রেজিমগুলো মজবুত সমর্থন আদায়ের প্রত্যাশা করে।

সবশেষে, আঞ্চলিক সংস্থাগুলো আরেকটি, আরও টেকনিক্যাল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে স্বৈরতন্ত্রীদের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে: তারা একটি কার্যকর 'ফোকাল পয়েন্ট' তৈরি করে, যেখানে কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারেন। আধুনিক বিশ্বে একনায়কতান্ত্রিক রেজিমগুলো গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান এবং বিরোধীদলীয় আন্দোলনের উত্থান থেকে শুরু করে জাতীয় সীমানা পেরিয়ে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং নাগরিকের ইমিগ্রেশনসহ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, সেগুলো মোকাবিলা করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল খুঁজে বের করার জন্য একে অপরকে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে।

তবে কেবল পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে এই অস্বচ্ছ কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির যুগে। প্রায়ই আন্তর্জাতিক ফোরাম ও সামিটে সরাসরি তথ্যের আদানপ্রদান কর্তৃত্ববাদী শাসকদের জন্য নিজ নিজ রেজিমের হুমকিগুলোকে প্রতিহত ও দমন করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় খুঁজে বের করার পথ সহজ করে তোলে। আঞ্চলিক সংস্থাগুলো জাতীয় নেতাদের নিয়মিত সমবেত করার মাধ্যমে এ রকম তথ্যের আদানপ্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংলাপের সুযোগের সৃষ্টি হয় এবং এভাবে কর্তৃত্ববাদী শিক্ষা বিকাশ লাভ করে।

অর্থনৈতিক সুবিধা এবং বৈধতা

পারস্পরিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি আরও অনেক কৌশল রয়েছে, যা আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন স্বৈরশাসকেরা নিজেদের সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান, আলংকারিক সমর্থন জোগানো এবং বৈধতা প্রদান করা।

পুনর্বণ্টন ও অর্থনৈতিক সুবিধা
স্বৈরতান্ত্রিক আঞ্চলিকতাবাদের শিথিল (Soft) কৌশলগুলো

আঞ্চলিক সংস্থা	শিথিল কৌশলের উদাহরণ প্রদত্ত অর্থনৈতিক সুবিধা	বৈধকরণের হাতিয়ার
অ্যালবা (ALBA)	তেল ভর্তুকির সুবিধা	বলিভারিয়ান সমাজতন্ত্র; যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বাগাড়ম্বর (rhetoric)
সিআইএস	অভিবাসন; শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার	নির্বাচন পর্যবেক্ষণ
এসসিও	ঋণ; অর্থসহায়তা; প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ; লোভনীয় ঠিকাদারি প্রকল্প; অবকাঠামো	'তিন শয়তানের' (সন্ত্রাস, চরমপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ) যুদ্ধরত থাকার দাবি
জিসিসি	তেলসম্পদ ব্যবহারের সুযোগ; উন্নয়ন তহবিল; শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার	রাজতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে বাগাড়ম্বর

বাস্তবে আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরে নেতৃস্থানীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর অনুকূলে সম্পদের পুনর্বণ্টন কীভাবে ঘটে? আসলে, এটা নির্ভর করে আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর কাঠামো এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মাত্রার ওপর (সাধারণ রূপরেখার জন্য টেবিলটি দেখুন)। পুনর্বণ্টনমূলক কৌশল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এমন একটি সংস্থা হলো ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভেনেজুয়েলা-নেতৃত্বাধীন বলিভারিয়ান অ্যালায়েন্স ফর দ্য পিপলস অব আওয়ার আমেরিকা (অ্যালবা)। এটি হলো স্বল্প কয়েকটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সংস্থা, যা একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলিভারিয়ান সমাজতন্ত্র। সাধারণভাবে একটি আঞ্চলিক-একীভূতকরণ (Regional-Integration) পদক্ষেপের যেসব উপাদান থাকতে পারে, কাঠামোগতভাবে এই সংগঠন তার প্রতিটিকে খারিজ করে বলে প্রতীয়মান হয়।

এই জোটের কমন অর্থনৈতিক ফোরাম হলো অ্যালবা কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্য পিপলস ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (Tratado de Comercio de los Pueblos)। এই সংঘ বহু দিক থেকেই মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল ধারণার বিপরীত একটি উদ্যোগ। এই চুক্তি সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোম্পানিগুলোকে সুনির্দিষ্ট

সহায়তা প্রদান, খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, নিজ নিজ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতগুলোকে সুরক্ষা প্রদান, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপরিচালিত জাতীয় প্রকল্পগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করা ইত্যাদি অনেক কিছু করার পরামর্শ দেয়। তবে কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধকালে কমিউনিস্ট ব্লকের রাষ্ট্রগুলো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকোনমিক অ্যাসিস্ট্যান্সের (কমেকন) মতো সহযোগিতার বাস্তব কোনো পদ্ধতি বাতলে দেয় না অ্যালবা। তার বদলে এই সংস্থা ভেনেজুয়েলা থেকে আদর্শিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন রেজিমগুলোতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় তেল রপ্তানির জন্য ধূম্রজাল হিসেবে কাজ করে।

পুনর্বণ্টনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হলো পেট্রোক্যারিবে ওয়েল অ্যালায়েন্স (আইনিভাবে স্বতন্ত্র কিন্তু অ্যালবার সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে), যা ২০০৫ সালে অস্তিত্ব লাভ করে। অবধারিতভাবেই, পেট্রোক্যারিবে একটি ঋণদানকারী সংস্থা: এটি ভেনেজুয়েলা থেকে তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। আমদানিকারক দেশকে তেল ডেলিভারির পরপর কোনো ক্ষেত্রে কিয়দংশ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বাকিটুকু ১৭ বা ২৫ বছর সময়কালের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। যদি অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র মূল্য পরিশোধ স্থগিত করতে চায়, তাহলে মাত্র ১ বা ২ শতাংশ সুদে তা পরিশোধ করার সুযোগ পায়। পেট্রোক্যারিবের মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্র কত তেল পাবে, তার কোটা নির্ধারিত থাকে, তবে কিছু রাষ্ট্র পদ্ধতিগতভাবে কোটার চেয়ে বেশি তেল নিতে পারে। এভাবে ২০১৫ সালে এল সালভাদরের কোটা নির্ধারিত হয়েছিল প্রতিদিন ৭ হাজার ব্যারেল, কিন্তু দেশটি আসলে প্রতিদিন ১২ হাজার ৯০০ ব্যারেল তেল আমদানি করেছিল। তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে পেট্রোক্যারিবে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে নিকারাগুয়া এই কাঠামোর মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় তেলের ৬০ শতাংশের বেশি গ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো চাইলে বিনিময়প্রথায় তেলের মূল্য পরিশোধ করতে পারে (যেমন ভেনেজুয়েলাকে মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষিপণ্য সরবরাহ করতে পারে)।[৭]

২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো পেট্রোক্যারিবের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলা থেকে ২৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ সহায়তা পেয়েছে।[৮] তা ছাড়া প্রধানত ভেনেজুয়েলা প্রদত্ত অর্থ ব্যবহার করে অ্যালবা অনেকগুলো তহবিল গঠন করেছে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা (যেমন অ্যালবা ক্যারিবিয়ান ফান্ড, যেখানে ভেনেজুয়েলার অবদান ছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার) কিংবা তাদের কৃষি খাতকে শক্তিশালী করার জন্য (যেমন অ্যালবা ফুড ফান্ড)। ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পেট্রোক্যারিবের ভবিষ্যৎ এবং অন্যান্য

পুনর্বণ্টনকৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[৯] কিন্তু এই প্রকল্প গত এক দশকজুড়ে ভেনেজুয়েলার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যার মাধ্যমে তারা বন্ধু রেজিমগুলোকে সহায়তা করেছে এবং অর্থনৈতিক সংকট কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে সুরক্ষা দিয়েছে।

ভেনেজুয়েলার এই উদার উপহার (largesse) কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক উপদলগুলোর মধ্যে পুনর্বণ্টনের লক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে হাজির হয়। কিন্তু এটা অনন্য ঘটনা নয়। ২০০৪ সালে চীন এসসিও (SCO) সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জন্য ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। আরও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, ২০০৯ সালে এসসিওর ইয়েতারিনবার্গ (Yekaterinburg) সম্মেলনের সময় চীন সংস্থার মধ্য এশীয় সদস্যদের ১০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দেয়।[১০] এই উদার অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের ঘটনা ঘটে ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কালে, যে সংকট ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া উভয় অঞ্চলের দেশগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রধানত চীনের সঙ্গে রাশিয়ার, যারা এসসিও ব্যাংক প্রতিষ্ঠা আটকে দিয়েছিল, বৈরিতার কারণে এই সংগঠনের কোনো যৌথ সংগঠন নেই, যা ব্যবহার করে চীনা তহবিল আদান-প্রদান করা যায়। ফলে, এই অর্থ দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। তারপরও, বৃহৎ চীনা ঋণ প্রকল্পগুলো ঘোষণার জন্য এসসিও সম্মেলনগুলোকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, প্রধানত তাদের বৈধতা বৃদ্ধি করার উপায় হিসেবে।

তহবিল পুনর্বণ্টন ও সস্তা সম্পদ সরবরাহের পাশাপাশি কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ ছোট রাষ্ট্রগুলোকে আরও অনেক সুবিধা প্রস্তাব করতে পারে। আঞ্চলিক উপদলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক পুনর্বণ্টনের পরোক্ষ ও সূক্ষ্ম কৌশল হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস (সিআইএস) ইউরেশিয়ায় একটি উদার অভিবাসন ব্যবস্থা চালু রেখে এসেছে, যার মাধ্যমে আর্মেনিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান থেকে হাজার হাজার শ্রমিককে রাশিয়ায় জীবিকা অনুসন্ধানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে যেসব দেশ থেকে এসব অভিবাসীরা আসেন, সেসব কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের নেতারা দুই ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রথমত, অভিবাসনের ফলে রেমিট্যান্সের প্রবাহ তৈরি হয়, যা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত বিক্ষোভগুলো গণ-অভ্যুত্থানের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হওয়া প্রতিরোধ করে (তাজিকিস্তানে বিদেশ থেকে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপির প্রায় ৫০ শতাংশ)।

দ্বিতীয়ত, কর্তৃত্ববাদী দেশ থেকে শ্রমিক পর্যায়ের রেমিট্যান্সপ্রাপ্তি প্রাপক রেজিমগুলোকে 'পলিটিক্যাল রেমিট্যান্সের' সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। পলিটিক্যাল রেমিট্যান্স হলো এমন পরিস্থিতি, যেখানে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র থেকে উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে অভিবাসন উৎস-দেশে ভয়াবহ সমস্যা তৈরি করে; কারণ, অভিবাসীরা সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। অভিবাসীরা যদি অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থার একীভূত শ্রমবাজারের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করে, তবে স্বৈরশাসকদের আর কোনো মাথাব্যথা থাকে না। বস্তুত, উৎস-রাষ্ট্র ও লক্ষ্য-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অভিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মানসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চমৎকার সুযোগ তৈরি করতে পারে।[১১]

বৈধতা ও আলংকারিক সহায়তা

এমনকি যদি একটি আঞ্চলিক সংস্থা খুব দুর্বলও হয় এবং কোনো বাস্তব সহযোগিতার পথ অন্বেষণ না করে নিজেকে কেবল উচ্চপর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প ঘোষণায় সীমাবদ্ধ রাখে, তারপরও তা ছোট কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর বৈধতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে। জাতীয় পর্যায়ের নেতারা খুব উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের আঞ্চলিক একীভূতকরণের সমর্থক হিসেবে উপস্থাপন করেন; তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে সফল, তাঁরা কর্তৃত্ববাদী সংস্থাগুলোর অস্তিত্ব (যেগুলোকে তাঁরা স্বীকৃতি দেন বলে দাবি করেন) এবং এগুলোর প্রকৃত কার্যসম্পাদনের সীমাবদ্ধতা (যার জন্য তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কিংবা বিদেশি সহযোগীদের দোষারোপ করেন)—দুই পরিস্থিতিতেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে লাভবান হন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেলারুশের আলেকজান্দর লুকাশেঙ্কার রেজিম ইউরেশিয়ায় আঞ্চলিক একীভূতকরণকে তার একটি প্রধান আদর্শিক খুঁটি বানিয়েছে। ক্ষমতায় আরোহণের একেবারে শুরু থেকেই লুকাশেঙ্কা বেলারুশিয়ানদের সমর্থন অর্জনের জন্য সোভিয়েত নস্টালজিয়ার ওপর নির্ভর করেছেন। বেলারুশকে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির বিরুদ্ধে ভোটদানকারী সর্বশেষ সুপ্রিম সোভিয়েতের একমাত্র সদস্য হিসেবে দাবি করে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক একীভূতকরণকে বেলারুশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান উপায় এবং বেলারুশকে এই পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে একমাত্র কান্ডারি হিসেবে উপস্থাপন করেন। গণতন্ত্রকামী বিরোধী নেতাদের নিয়মিতভাবে সেই একীভূতকরণের প্রক্রিয়া নষ্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে লুকাশেঙ্কা রাশিয়ার অভিজাতদেরও অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেননি যে দুই দেশের জনগণ চাইলেও আঞ্চলিক একীভূতকরণ নিয়ে তারা একই রকম উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হতে আগ্রহী নয়। দিন যত যায়, লুকাশেঙ্কার যুক্তি তত দুর্বোধ্য হতে থাকে। নব্বইয়ের দশকে

তিনি যেখানে রাশিয়ার সঙ্গে সর্বোচ্চ-সম্ভব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একীভূতকরণের ডাক দিয়েছিলেন, বিশ শতকের প্রথম দশকে এসে তিনি একীভূতকরণের সঙ্গে বেলারুশিয়ান সার্বভৌমত্বের ওপরও জোর দিতে থাকেন।

তবে তাঁর রেজিমের প্রধান অর্জন হিসেবে আঞ্চলিক একীভূতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা কমেনি। ১৯৯১ সাল থেকে বেলারুশ রাশিয়ার সঙ্গে বহুসংখ্যক আঞ্চলিক সংস্থায় অংশীদার হয়েছে: সিআইএস; কালেক্টিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সিএসটিও); ইউনিয়ন স্টেট অব রাশিয়া অ্যান্ড বেলারুশ; ইউরেশিয়ান ইকনোমিক কমিউনিটি; ইউরেশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ইউরেশিয়ান ইকনোমিক ইউনিয়ন। কার্যকারিতার দিক থেকে লুকাশেঙ্কার দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা থাকলেও (যেমন এটা আঞ্চলিক সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়িত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কারণে বিক্ষুব্ধদের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না) তা দীর্ঘকালব্যাপী জনগণের আনুগত্য নিশ্চিত করার কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।

১৯৯১ সালে সিআইএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অর্থনৈতিক প্রভাব কমানোর জন্য। যা হোক, সময়ের সঙ্গে সংস্থার ভিত্তি-রাষ্ট্র রাশিয়ায় কর্তৃত্ববাদ জেঁকে বসলে সিআইএস স্বৈরতান্ত্রিক রেজিমকে শক্তিশালীকরণ-সংক্রান্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কর্তৃত্ববাদকে সমর্থন করার জন্য সিআইএসের টুলবক্সের সবচেয়ে দৃশ্যমান হাতিয়ার হলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। অনুগত নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যাপারে ভুল তথ্য ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা কর্তৃত্ববাদের বৃহত্তর কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ থাকে।[১২] সিআইএস ২০০১ ও ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো তাদের পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েছিল এবং দিনে দিনে তা সংখ্যা ও পরিধিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নব্বইয়ের দশক থেকে সিআইএস কয়েকটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শাখা চালু করেছে। এখন মূল সিআইএস এবং এই সংস্থার আন্তসংসদীয় সম্মেলন উভয় পক্ষ থেকেই পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। ২০০৪ সালে সিআইএস তাদের পর্যবেক্ষক দলসংক্রান্ত (মিশন অব অবজারভার) একটি বিশেষ বিধিমালা পাস করেছে এবং ২০০৬ সালে তারা প্রতিষ্ঠা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মনিটরিং ডেমোক্রেসি ডেভেলপমেন্ট, পার্লামেন্টারিয়ানিজম অ্যান্ড সাফরেজ প্রটেকশন অব সিটিজেনস।

সিআইএস পর্যবেক্ষকেরা প্রায়ই ওএসসিইর (অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ) পর্যবেক্ষকদের মতো একই ভাষায় কথা বলেন (যেমন তারা নির্বাচনে আরও স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান),

কিন্তু এসব বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থ আরোপ করেন। উদাহরণস্বরূপ, সিআইএস প্রতিনিধিদের কাছে স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধান ঝুঁকি কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন শাসক দল কর্তৃক নির্বাচনকে প্রভাবিত করা নয়, বরং পশ্চিমা হস্তক্ষেপ।

সিআইএসের পর্যবেক্ষকেরা প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি ক্ষেত্রে—২০০৪ সালের ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দ্বিতীয় রাউন্ড, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কমলা বিপ্লব' নামের গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল—নির্বাচনের নিন্দা করেছেন। এই বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল জালিয়াতির মাধ্যমে ইনিশিয়াল সেকেন্ড রাউন্ডে (ইউক্রেনের আইন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দুই রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালের নির্বাচনে প্রথম রাউন্ড ভোটে জালিয়াতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে দ্বিতীয় রাউন্ড ভোট পুনর্বার অনুষ্ঠিত হয়) পাশ্চাত্যঘেঁষা প্রার্থী ভিক্টর ইউশেঙ্কোকে হারিয়ে রাশিয়াপন্থী প্রার্থী ভিক্টর ইয়ানুকোভিকের বিজয়ের প্রেক্ষাপটে। ইয়ানুকোভিকের এই বিজয় সিআইএসের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। ফলে, অধিকতর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিদ্যমান, এমন কিছু সিআইএসভুক্ত রাষ্ট্র (ইউক্রেন ও মালদোভা) ক্রমান্বয়ে সিআইএস পর্যবেক্ষকদের দ্বারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের আবেদন জানাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। তবে এ রকম প্রত্যাখ্যান আসলে শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকেই শক্তিশালী করছে—এ রকম সিদ্ধান্তকে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো এভাবে কাজে লাগাতে পারে যে নির্বাচনে তাদের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা হয়েছে তা অগণতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ক্ষমতাসীনেরা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণকে ভয় পায়। এভাবে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনামহানি করে। নাটকের এসব পর্ব রাশিয়ার প্রচারযন্ত্র উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং স্বয়ং সিআইএসের অঙ্গসংগঠনগুলো তা ফলাও করে প্রচার করে।

পুনর্বণ্টনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি অ্যালবা ও এসসিও উভয়ই কর্তৃত্ববাদী রেজিমের বৈধতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণ আমেরিকায় স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো টিকে থাকার ক্ষেত্রে অ্যালবার অবদান দ্বিমুখী। ভেনেজুয়েলায় নিকোলাস মাদুরোর রেজিমের জন্য তারা রাজনৈতিকভাবে কার্যকর বলিভারিয়ান সমাজতন্ত্রের জিকির তোলে, যা অন্য রাষ্ট্রগুলোকে আকর্ষণ করে (যদিও বর্তমানে ভেনেজুয়েলা চিরস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হওয়ার কারণে তা রেজিমের টিকে থাকার জন্য আর বিশেষভাবে কাজে আসবে না)। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের জন্য কর্তৃত্ববাদ সুসংহত হবে এমন সব পদক্ষেপ, যেমন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, এগুলোর ব্যাপারে খুঁটির জোর দেয় অ্যালবা।[১৩]

একইভাবে এসসিও তার সদস্যরাষ্ট্রগুলো কর্তৃক কর্তৃত্ববাদী শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে সমর্থন ও সেগুলোর

যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে। অ্যালবা জনতুষ্টিবাদী, আমেরিকাবিরোধী বাগাড়ম্বরের ওপর নির্ভর করে। অন্যদিকে এসসিও তার সদস্যরাষ্ট্রদের গৃহীত পদক্ষেপকে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা, চীনা নেতারা যেটিকে 'তিন শয়তান' হিসেবে চিহ্নিত করেন, তা প্রতিহত করার প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহার ও বাছবিচারহীন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই শব্দমালা যেকোনো ধরনের অভ্যন্তরীণ বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। এবং এগুলোর মাধ্যমে শুধু রক্ষণশীল অভ্যন্তরীণ নীতিমালা নয়; তথ্য বিনিময় এবং দেশগুলোর মধ্যে অন্যান্য ধরনের সহযোগিতার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এসসিও রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসের অভিযোগ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বীকৃতির নীতি মেনে চলে, যা তাদের এসসিও অঞ্চলের যেকোনো প্রান্তে অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়া চালু করার অনুমোদন দেয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে এসসিও যেভাবে তার সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা সদস্যরাষ্ট্রগুলোতে মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনমনের জন্য দায়ী।[১৪]

কঠোর কৌশল : সামরিক হস্তক্ষেপ

যদিও কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, স্বৈরতন্ত্রের প্রসারের জন্য এসব সংস্থার প্রয়োগ করা কৌশল ভিন্ন ভিন্ন। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে উদারহস্ত ঋণ ও আলংকারিক সমর্থন (এসসিও যা করে থাকে), উদার অভিবাসন ব্যবস্থা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রকল্প (সিআইএস), অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদ ও আদর্শিক সমর্থন (অ্যালবা)। প্রভাব বিস্তারের উল্লিখিত পুনর্বণ্টন ও বৈধতাদানের মতো নমনীয় কৌশলের বাইরে আরেক ধরনের প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা রয়েছে। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশের আঞ্চলিক সংস্থা গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) কর্তৃক ব্যবহৃত সামরিক হস্তক্ষেপের কৌশল।

অন্যান্য কর্তৃত্ববাদী সংস্থার তুলনায় ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত জিসিসি অধিকতর প্রকাশ্য নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। আনুষ্ঠানিক ম্যান্ডেট অর্থনৈতিক হলেও এই সংস্থাকে বারবার যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৮০-এর দশকে জিসিসি তৈরি করেছিল পেনিনসুলা শিল্ড জয়েন্ট ফোর্সেস, যা ২০১০ সালের শুরুর দিকে প্রায় ৪০ হাজার সেনাবাহিনীর দলে পরিণত হয়েছে।[১৫] ২০১১ সালে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন ও ক্ষমতাসীন রাজা হামাদকে সমর্থন করার জন্য বাহরাইনে এক সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্যোগ গ্রহণ করে সৌদি আরব। আরব বসন্তের অনুপ্রেরণায় দেশে গণতন্ত্রায়ণ এবং উন্নততর মানবাধিকার সুরক্ষার দাবিতে ২০১১ সালে এই আন্দোলনের সূচনা

হয়েছিল। ২০১১ সালের মার্চে রাজা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং বাহরাইনের প্রধান অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানগুলো সুরক্ষার নামে জিসিসি (সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে) প্রায় ১ হাজার ৫০০ সেনা ও সেনা-পুলিশ মোতায়েন করে। যদিও সৌদি বাহিনী আন্দোলন দমনে সরাসরি জড়িত হয়নি, তবু তাদের উপস্থিতি সে দেশের সরকারকে কঠোরতর পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, যা শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দমন আকারে রূপ নিয়েছে।[১৬]

অন্য ক্ষেত্রে, সদস্য স্বৈরতান্ত্রিক-রাষ্ট্রগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য জিসিসি অর্থনৈতিক প্রণোদনার নীতি প্রয়োগ করেছে। ২০১১ সালে তারা হাইড্রোকার্বনবিহীন (উল্লেখযোগ্য উদযান ও অঙ্গারযান যৌগিক পদার্থজাত সম্পদ) দুই আরব রাষ্ট্র জর্ডান ও মরক্কোকে, পার্শ্ববর্তী তেলনির্ভর রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় যাদের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ নিম্ন, সদস্যপদ প্রদান করেছে। এটা তারা করেছে রেজিমের স্থিতিশীলতার নামে, এই আশায় যে এই দুই বন্ধু-রাজতন্ত্রে আরব বসন্তের বিস্তার রোধ করা যাবে। জিসিসির সদস্য হওয়া মানে সংস্থার ধনী দেশগুলোর উন্নয়ন অর্থায়নে প্রবেশাধিকার: মরক্কো ও জর্ডানকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলাকালে জিসিসি এই দুই দেশের প্রকল্পগুলোকে সহায়তা করার জন্য (৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের) একটি উন্নয়ন তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয়। তা ছাড়া জিসিসির সদস্য হলে এই দুই দেশের জন্য তেলের দাম কমে যাবে, বিশেষ করে জর্ডান, যারা তাদের ৯৫% তেল কেনে জিসিসি থেকে—তাদের জন্য এটা ছিল বিরাট একটি সুবিধা। সর্বশেষ, উপসাগরীয় রাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় মরক্কো ও জর্ডানের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জিসিসিতে যোগদান করলে তাদের জন্য সেসব দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার সহজতর হবে।[১৭] আরব বসন্তের শেষে জর্ডান ও মরক্কোর প্রতি সদস্যপদ আহ্বান স্থগিত করা হয়, তবে ২০১৪ সালে আরেকবার আহ্বান করা হয়।[১৮] ২০১৬ সালে জর্ডান জিসিসি শক্তিবলয়ে যোগ দিতে সম্মতি জানায়। রাজনৈতিক পরিবর্তন যদি এই দুই রাজতান্ত্রিক রেজিমের প্রতি নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, তাহলে এই সদস্যপদের প্রশ্ন আবার ভেসে উঠতে পারে।

কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ কি একুশ শতকের শুরুতে সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত নতুন প্রবণতা, নাকি বিশ্বরাজনীতিতে আগেও বিদ্যমান ছিল? আশি ও নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্রায়ণের ঐতিহাসিক প্রবাহ সম্পর্কে স্যামুয়েল হান্টিংটনের গবেষণাকর্ম রাজনৈতিক রেজিম পরিবর্তনের চলকগুলো বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।[১৯] তাঁর গণতন্ত্রায়ণের প্রবাহচক্র এবং এসব প্রবাহের ভৌগোলিক কেন্দ্রসংক্রান্ত ধারণা পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। তুলনায় নগণ্য মনোযোগ দেওয়া হয়েছে স্বৈরতন্ত্রায়ণের প্রবাহ সম্পর্কে, যার উদ্ভব ১৭৯০-এর দশকে।

স্বৈরতন্ত্রায়ণের এসব প্রবাহের সঙ্গে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্ত ছিল, যাদের বর্তমানের কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থা—যারা গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত, অপর দেশের বিপ্লবকে দমন এবং নিজেদের পছন্দের আদর্শের রাজত্বের বিস্তৃতি করতে চায়—তাদের ঐতিহাসিক পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ রকম বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্মই হয়েছিল ১৭৯২ সালের ফার্স্ট কোয়ালিশন (কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের জোট, যারা ১৭৯২ থেকে ১৭৯৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রেঞ্চ ফার্স্ট রিপাবলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল) থেকে ১৮১৫ সালের হলি অ্যালায়েন্স পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে (হলি অ্যালায়েন্স নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ইউরোপে উদারনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার রোধকল্পে ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত তিন পরাক্রমশালী রাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার জোট। বাহ্যত রাজার স্বর্গীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত এই জোট ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-১৮৫৬) পর্যন্ত তার প্রভাববলয় টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল)। তবে এসব জোটের দৃষ্টি এককভাবে সামরিক পদক্ষেপের ওপর নিবদ্ধ ছিল; এসব জোটের কেউই আন্তসরকারি সংস্থা গঠন করেনি। ফলে, তারা আধুনিক অর্থে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি।

অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থা-যুগের উৎসবিন্দু চিহ্নিত করা যাবে ১৯৪০-এর দশকে, যখন ১৯৪৫ সালে আরব লীগ এবং ১৯৪৯ সালে কমেকন (COMECON) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্বসূরি ইউরোপীয় কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে। ফলে গণতান্ত্রিক আঞ্চলিকতাবাদের সর্বপরিচিত দৃষ্টান্তের চেয়েও পুরোনো কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের ইতিহাস। আরব লীগ ও কমেকন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমধারণ করে। একদিকে, দুটি সংস্থাই শক্তিশালী আদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত : প্রথম ক্ষেত্রে প্যান-আরববাদ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কমিনিউজম। অন্যদিকে, পরবর্তীকালে আবির্ভূত আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মতো এই দুই জোটের কেউই প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপীয় আঞ্চলিতাবাদের ব্লু প্রিন্ট অনুসরণ করেনি।

বস্তুত কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির দেশগুলোর সংগঠন হিসেবে দিনে দিনে কমেকন ধারাবাহিক পশ্চিম ইউরোপীয় জোটবদ্ধতার একটি বিকল্প হাজির করার চেষ্টা করেছে। এই দুই আদি কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাই গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে। কমেকনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্নায়ুযুদ্ধের সময় তার পূর্ব ইউরোপীয় স্যাটেলাইট রাষ্ট্রগুলো এবং কিউবা ও ভিয়েতনামের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এটা সদস্যদেশগুলোতে কমিনিউস্ট শাসনের শিকড় প্রোথিত করার উপায় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

আরেকটি, আরও পুরোনো, কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের দৃষ্টান্ত হলো সাউদার্ন আফ্রিকান কাস্টমস ইউনিয়ন (সাকু)। ১৯৯০ সালে প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক সীমানার ভেতরে প্রতিষ্ঠিত সাকু বিউপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া উতরে টিকে থাকে। কমেকন ও আরব লিগের মতো এর কোনো আদর্শিক ভিত্তি নেই। একই সঙ্গে এটি আঞ্চলিকতাবাদের এমন একটা মডেল অনুসরণ করেছে, যা গণতান্ত্রিক ইউরোপে গড়ে ওঠা মডেলের চেয়ে ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর না করে ছোট রাষ্ট্রগুলো (বতসোয়ানা, লেসোথো, সোয়াজিল্যান্ড—যার মধ্যে দুটি দেশ স্বৈরতন্ত্রকে সুসংহত করেছে) সংস্থার সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণের অধিকার হস্তান্তর করেছে তখনকার বর্ণবাদী শাসনাধীন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এভাবে আঞ্চলিক আধিপত্য ও স্বৈরতান্ত্রিক বর্ণবাদী রেজিমের বিরুদ্ধে আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয় সাকু।[২০]

আঞ্চলিকতাবাদ : নতুন ও পুরোনো

ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাকে অনুকরণ করে নতুন আঞ্চলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার একটি ঢেউ তৈরি হয়। এ ধরনের অধিকাংশ উদাহরণ, যাকে বর্তমানে 'পুরোনো আঞ্চলিকতাবাদ' হিসেবে অভিহিত করা হয়, উদ্ভব হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকের দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় এবং এগুলো অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থার শ্রেণিতেই পড়ে। এই সংস্থাগুলো তাদের স্রষ্টাদের মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল কাগজ-কলমের আঞ্চলিকতাবাদে পরিণত হয়। এ রকম আঞ্চলিক সংস্থা বহুসংখ্যক চুক্তি সাক্ষর, বৈঠক আয়োজন এবং আন্তসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পরও বাস্তব নীতিমালার ওপর এদের কোনো প্রভাব থাকে না। এ রকম অধিকাংশ অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থা তার সদস্যরাষ্ট্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা সদস্য রেজিমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। 'আমলাতান্ত্রিক মানরক্ষা প্রকল্প' থেকে এর ফারাক আসলে খুব বেশি নয়।

তবে এ রকম কিছু সংস্থা কর্তৃত্ববাদী রেজিমকে শক্তিশালী করতে কাজ করেছে, যাদের অনেকেই জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রাধান্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহিরাগত হস্তক্ষেপের সমালোচনা করেছে। এটাই ছিল অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির (বর্তমান আফ্রিকান ইউনিয়নের পূর্বসূরি) প্রধান নীতি, যারা সাবেক ঔপনিবেশিক সীমানাগুলোর স্বীকৃতির ওপর জোর দিয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান ন্যাশনসের (আসিয়ান) ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করেছে যে 'আসিয়ান ওয়ে' ধারণা,

কিংবা এখনো টিকে আছে এ রকম অনেক দক্ষিণ আমেরিকান সংস্থার মূলনীতিও ছিল তা-ই।[২১] স্নায়ুযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী মিত্রদের সমর্থন করতে আগ্রহী ছিল। তখন এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ ছিল গণতন্ত্রের হুমকির চেয়ে বৈরী কর্তৃত্ববাদী রেজিম কর্তৃক চোখ রাঙানিই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া। 'অ-হস্তক্ষেপ' নীতির (non-interference) ওপর জোর প্রদান করে এই আধুনিক অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাগুলো স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংঘাত এড়াতে সাহায্য করেছে। তা না হলে এই রেজিমগুলো দুর্বল এবং ক্রমান্বয়ে অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারত।

সময়ের সঙ্গে অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এটা এ জন্য নয় যে বর্তমান সংস্থাভুক্ত দেশগুলোয় গণতন্ত্রায়ণ হয়েছে। বরং তা হয়েছে পুরোনো সংস্থাগুলোর বিলুপ্তি কিংবা নতুন গণতান্ত্রিক সংস্থার জন্মের ফলে। সদস্যরাষ্ট্রগুলো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে কিছু সংস্থা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক একীভূতকরণ পরিকল্পনা পরিচালনা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০-এর দশকে আসিয়ান ছিল প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের বিস্তৃতি ঠেকানোর জন্য অগণতান্ত্রিক দেশগুলোর জোট। কালক্রমে তা কার্যকর অর্থনৈতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছে (যদিও গণতন্ত্রকে উৎসাহিত করার অর্থপূর্ণ কৌশল নিরূপণের জন্য এখনো এই সংস্থাকে বহু পথ পাড়ি দিতে হবে)।[২২]

সদস্যরাষ্ট্রগুলোর গণতন্ত্রায়ণের মুখে এসব অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকাঠামো পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের পতনের পর সাকু দক্ষিণ আফ্রিকার একক আধিপত্যের পরিবর্তে বহুজাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে নতুন একধরনের শাসনকাঠামোর পক্ষে সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং অনুমোদন করেছে। অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বিরল। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে কাঠামোগত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে কমেকনের (COMECON) পতন।

একুশ শতকের প্রথম দশকের শুরুতে সোভিয়েত-উত্তর ইউরেশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বল হয়ে পড়া এবং কর্তৃত্ববাদী রেজিমের উত্থান এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক নেতা হিসেবে রাশিয়া ও ভেনেজুয়েলার আবির্ভাবের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের এক নতুন জোয়ার দেখা যায়। এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরব মিলে সাম্প্রতিক কালে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের মাঠে সবচেয়ে সক্রিয় খেলোয়াড়। ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মতো সমসাময়িককালে জন্ম নেওয়া অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাগুলোও সাধারণভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে

অনুকরণের ব্যাপারে উদগ্রীব, বিশেষ করে তাদের নীতি-পরিচালনা সংস্থা এবং আঞ্চলিক একীভূতকরণের বিভিন্ন পর্যায় (মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল, কাস্টমস ইউনিয়ন, ইকোনমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি) আলোচনা করতে গিয়ে (ইউরোপীয় ইউনিয়নের) একই ভাষা ব্যবহার করার মাধ্যমে। আগেই যেমন বলা হয়েছে, অ্যালবা (ALBA) এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম।

ষাটের দশকের পূর্বসূরিদের তুলনায় একুশ শতকের প্রথম দশকে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাগুলো লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন বৈশ্বিক পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানের কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক জোটগুলোকে এমন এক পৃথিবীতে কাজ করতে হয়, যেখানে গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসার বহুধাবিস্তৃত। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরেশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রধান হুমকি অন্য স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক হস্তক্ষেপ নয়, বরং ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ও সমূলে (organic) বিস্তৃতি।

এই পরিস্থিতি বিবেচনায় অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাগুলো অনুমিতভাবেই সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে গণতন্ত্রায়ণের দিকে ঠেলে দিতে পারে, এমন বহিঃশক্তি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার আকর্ষণীয় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সব অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাই কর্তৃত্ববাদের প্রসারের উদ্দেশ্যে কিংবা বহিরাগত গণতান্ত্রিক প্রভাব রুখতে প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিদ্বৎসমাজ ও নীতিপ্রণেতাদের এটা স্বীকার করতে হবে যে উল্লিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে বহু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরও বহু সংস্থাই সময়ের বিবর্তনে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আঞ্চলিকতাবাদের পুনর্বিচার

কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আঞ্চলিকতাবাদ নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থা এবং গণতন্ত্রের বিকাশে তাদের সক্ষমতার প্রতিই গবেষকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। অথচ অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং অনেকাংশেই অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সংস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণিভাগ রয়েছে। সাধারণভাবে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের উদ্যোগে শক্তিশালী কূটনৈতিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে গঠিত এসব সংস্থা স্বৈরতন্ত্রকে বলবান করা এবং এমনকি কর্তৃত্ববাদের প্রসারের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে—যে লক্ষ্যে তারা পৌঁছায় কর্তৃত্ববাদী রেজিমগুলোকে বৈধতাদান এবং দুর্বল সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পদের পুনর্বণ্টনের মধ্য দিয়ে। কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিক সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে বৈধতাদানের পাশাপাশি তার সদস্য রেজিমগুলোর অভ্যন্তরীণ জনগণের চোখে রেজিমের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

রেজিম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকার বহিরাগত প্রভাবের মতো আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক স্বৈরতন্ত্র প্রচারের সাফল্যকেও অতিগুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে না।[২৩] বহিরাগত শক্তি তখনই স্বৈরতন্ত্রের বীজ বপনে সহায়তা করতে পারে, যখন সেখানকার মাটি থাকে উর্বর। তবে গণতন্ত্রায়ণের সম্ভাবনা অনিশ্চিত, এ রকম দেশে কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ ভারসাম্যের পাল্লা একদিকে ভারী করে দিতে পারে।

ওপরে আলোচিত ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে সার্বিকভাবে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজেদের আঞ্চলিক সংস্থা তৈরি এবং এগুলোর মাধ্যমে বহিরাগত গণতান্ত্রিক প্রভাব থেকে সুরক্ষার মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের সুরক্ষা ও প্রসারে আগ্রহী। তবে এসব সংস্থা সাধারণভাবে সার্বভৌমত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র থাকে (চীন, রাশিয়া, সৌদি আরব কিংবা ভেনেজুয়েলা), যারা সংস্থার প্রাথমিক নকশা প্রণয়ন করে। অ্যালবা ও সিআইএসের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র বাজেটের সিংহভাগ প্রদান করেছে। তবে এর মানে এই নয় যে অপর সদস্যরা কেবল নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নীতির নিষ্ক্রিয় পরিপোষক। কোনো ক্ষেত্রে বস্তুত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোই (বেলারুশ ও ইকুয়েডর) অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে বেশি সক্রিয় থাকে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা এসব সংস্থাকে অর্থনৈতিক সুবিধা, নির্বাচন কারচুপি বৈধকরণ এবং সামরিক নিগ্রহকে সমর্থনের মাধ্যমে তাদের রেজিমকে স্থিতিশীল করার মূল্যবান হাতিয়ার মনে করে।

কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদ পশ্চিমা রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক নটবররোই যখন আঞ্চলিকতাবাদকে একটি ব্যাপকভাবে গৃহীত মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন, ইইউ সারা বিশ্বের আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েক দশকজুড়ে পদ্ধতিগতভাবে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ঘটিয়েছে। এর ফলাফল হলো কর্তৃত্ববাদী আঞ্চলিকতাবাদের বৈধতাকে শক্তিশালীকরণ এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন ও গণতন্ত্রায়ণপ্রক্রিয়াকে সমূলে বিনাশ করার ক্ষেত্রে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সুতরাং অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর ঘোষিত আনুষ্ঠানিক লক্ষ্যের ধূম্রজাল সরিয়ে গভীরে দৃষ্টিপাত করা এবং এগুলোর সম্ভাব্য অভিঘাত সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। অবশ্যই কেউ সব অগণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংস্থাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করতে পারে না। সব সংস্থাই স্বৈরতন্ত্রের প্রসার করতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এদের নীতি-পরিণতির মধ্যেও রয়েছে বিভিন্নমুখিনতা। তবে গবেষক ও নীতিপ্রণেতাদের এটা স্বীকার করে নেওয়া অতীব জরুরি যে

আঞ্চলিকতাবাদ কখনো কখনো গণতন্ত্রায়ণের অনুঘটক নয়, বরং এর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে পারে।

[লেখাটি *জার্নাল অব ডেমোক্রিস* সাময়িকীর অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)

টীকা

লেখকদের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে দেওয়া হয়েছে; এই নিবন্ধে তাঁরা সমানভাবে অবদান রেখেছেন। আনাসতেসিয়া ভি. অবিডেঙ্কোভা প্রিন্সটন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি), হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডেভিস সেন্টার ফর রাশিয়ান অ্যান্ড ইউরেশিয়ান স্টাডিজের প্রতি কৃতজ্ঞ এই নিবন্ধে উপস্থাপিত তাঁর গবেষণায় সহায়তার জন্য। তাঁর গবেষণায় সহ-অর্থায়ন করেছে প্রিন্সটন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজের (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি) ফাংং গ্লোবাল ফেলোস প্রোগ্রাম এবং নিইহউস সেন্টার ফর গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড গভর্ন্যান্স, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি।

১. See also Alexander Cooley, "Authoritarianism Goes Global: Countering Democratic Norms," *Journal of Democracy* 26 (July 2015): 56-58; Alexander Libman and Anastassia Obydenkova, "Informal Governance and Participation in Non-Democratic International Organizations," *Review of International Organizations* 8 (June 2013): 221-43; Obydenkova and Libman, *Authoritarian Regionalism in the World of International Organizations: Global Perspective and Eurasian Enigma*(forthcoming from Oxford University Press). On cooperation of autocracies in general, see Alexander Cooley, "The League of Authoritarian Gentlemen," *Foreign Policy*, 30 January 2013, http://foreignpolicy.com/2013/01/30/the-league-of-authoritarian-gentlemen (http://foreignpolicy.com/2013/01/30/the-league-of-authoritarian-gentlemen).

২. Edward D. Mansfield, Helen V. Milner, and B. Peter Rosendorff, "Why Democracies Cooperate More: Electoral Control and International Trade Agreements," *International Organization* 56 (Summer 2002): 477-513; Ernst B. Haas, "International Integration: The European and the Universal Process," *International Organization* 15 (Summer 1961): 366-92.

৩. Kurt Taylor Gaubatz, "Democratic States and Commitment in International Relations," *International Organization* 50 (Winter 1996): 109-39.

৪. Joseph Jupille, Brandy Jolliff, and Stefan Wojcik, "Regionalism in the World Polity," (unpublished manuscript, 2013).

৫. Andreas Schedler, "Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation," *Journal of Democracy* 13 (April 2002): 36-50.

৬. Nataliya A. Vasilyeva and Maria L. Lagutina, *The Russian Project of Eurasian Integration: Geopolitical Prospects* (Lanham, MD: Lexington Books, 2016), 104.

৭. Evolution of the PetroCaribe Energy Cooperation Agreement (Caracas : Sistema Econ mico Latinoamericano y del Caribe, 2015).

৮. Otaviano Canuto, "Oil Prices and the Future of Petrocaribe," *Huffington Post*, 28 September 2015, www.huffingtonpost.com/otaviano-canuto/oil-prices-andthe-future_b_8209010.html (http ://www.huffingtonpost.com/otaviano-canuto/oil-prices-and-the-future_b_8209010.html) .

৯. Tjerk Br hwiller, "Caracas isoliert sich selbst," *Neue Z rcher Zeitung*, 27 April 2017, www.nzz.ch/international/schwindender-einfluss-und-rueckhalt-venezuelabegibtsich-in-die-isolation-ld.1289254 (http ://www.nzz.ch/international/schwindender-einfluss-und-rueckhalt-venezuela-begibtsich-in-die-isolation-ld.1289254) .

১০. Aliya Samigullina and Ksenia Solyanskaya, "Sammit na 10 milliardov dollarov" [Summit for $10 billion], *Gazeta*, 16 June 2009, www.gazeta.ru/politics/2009/06/16_a_3211415.shtml (http ://www.gazeta.ru/politics/2009/06/16_a_3211415.shtml).

১১. See Mark Galeotti, "'RepressIntern' : Russia's Security Cooperation with Fellow Authoritarians," *OpenDemocracy*, 22 November 2016, www.opendemocracy.net/od-russia/mark-galeotti/repressintern-russian-security-cooperation-with-fellow-authoritarians (http ://www.opendemocracy.net/od-russia/markgaleotti/repressintern-russian-security-cooperation-with-fellow-authoritarians).

১২. Patrick Merloe, "Authoritarianism Goes Global : Election Monitoring vs. Disinformation," *Journal of Democracy* 26 (July 2015) : 79-93; Christopher Walker and Alexander Cooley, "Vote of the Living Dead," Foreign Policy, 31 October 2013, http ://foreignpolicy.com/2013/10/31/vote-of-the-living-dead (http ://foreignpolicy.com/2013/10/31/vote-of-the-living-dead) ; Rick Fawn, "Battle over the Box : International Election Observation Missions, Political Competition and Retrenchment in the Post-Soviet Space," *International Affairs* 82 (November 2006) : 1133-53.

১৩. Paul D'Anieri, "Autocratic Diffusion and the Pluralization of Democracy," in Louis W. Pauly and Bruce W. Jentleson, eds., *Power in a Complex Global System* (New York : Routledge, 2014).

১৪. Counter-Terrorism and Human Rights : The Impact of the Shanghai Cooperation Organization (Human Rights in China, 2011); Thomas Ambrosio, "Catching the 'Shanghai Spirit' : How the Shanghai Cooperation Organisation Promotes Authoritarian Norms in Central Asia," *Europe-Asia Studies* 60 (October 2008) : 1321-44; Shanghai Cooperation Organization : A Vehicle of Human

Rights Violations (International Federation for Human Rights, 2012).

১৫. Shenaz Kermali, "The GCC Is Expanding Its Army, But for What?" *Al Jazeera*, 2 July2011, www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201162611264984538 6.html (http ://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201162611264984 5386.html) .

১৬. Jean-Fran ois Seznek, "Saudi Arabia Strikes Back," *Foreign Policy*, 14 March 2011, http ://foreignpolicy.com/2011/03/14/saudi-arabia-strikes-back-2 (http ://foreignpolicy.com/2011/03/14/saudi-arabia-strikes-back-2) .

১৭. "An Exclusive Club : GCC Membership Would Benefit Both Parties," Oxford Business Group, https ://oxfordbusinessgroup.com/analysis/exclusive-club-gccmembership-would-benefit-both-parties.

১৮. Curtis Ryan, "Jordan, Morocco and an Expanded GCC," *Middle East Research and Information Project*, 15 April 2014, www.merip.org/jordan-moroccoexpanded-gcc (http ://www.merip.org/jordan-morocco-expanded-gcc) .

১৯. Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave," *Journal of Democracy* 2 (Spring 1991) : 12-34.

২০. Kathleen J. Hancock, *Regional Integration : Choosing Plutocracy* (Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2009); Richard Gibb and Karen Treasure, "SACU at Centenary : Theory and Practice of Democratising Regionalism," *South African Journal of International Affairs* 18, no. 1 (2011) : 1-21.

২১. On ASEAN, see Amitav Acharya, "Democratisation and the Prospects for Participatory Regionalism in Southeast Asia," *Third World Quarterly* 24 (April 2003) : 375-90; on Latin American organizations, see Christopher Sabatini, "Meaningless Multilateralism," *Foreign Affairs*, 8 August2014, www.foreignaffairs.com/articles/south-america/2014-08-08/meaningless-multilateralism (http ://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/2014-08-08/meaninglessmultilateralism).

২২. J rn Dosch, "ASEAN's Reluctant Liberal Turn and the Thorny Road to Democracy Promotion," *Pacific Review* 21, no. 4 (2008) : 527 45.

২৩. Lucan A. Way, "The Limits of Autocracy Promotion : The Case of Russia in the 'Near Abroad,'" *European Journal of Political Research* 54 (November 2015) : 691-706.

রাজনৈতিক অর্থনীতি

বিপন্ন পৃথিবীতে আন্দোলনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

খলিলউল্লাহ্

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে পৃথিবীর বিপন্নতা বলতে পরিবেশ ও জলবায়ু সংকটের কথা বোঝানো হয়েছে। পৃথিবীর বিপন্নতার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রগুলো অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে এসব বহুজাতিক কোম্পানি বা করপোরেশনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার প্রচেষ্টায়। এমন পরিস্থিতিতে ধরে নেওয়া হয় যে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে পৃথিবী বাঁচানোর চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু সত্যিই কি আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবী বাঁচানোর প্রচেষ্টা সফল হবে? এই প্রশ্ন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, যখন দেখা যায় যে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু যারা, তারাই আন্দোলন সংগঠনে টাকা ঢালছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এসব আন্দোলন কতটুকু সফল হবে। আর করপোরেট অর্থায়ন ছাড়া যেসব তৃণমূল আন্দোলন, সেগুলোও সামরিক কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পুলিশের সামরিকীকরণের মাধ্যমে পদদলিত হওয়া এসব আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারে না। ফলে, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। এই বিষয়গুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস ও করপোরেট অর্থায়নে পরিচালিত আন্দোলনের বিস্তৃত বিশ্লেষণে বহুলাংশে নির্ভর করা হয়েছে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার ডওভারনের কাজের ওপর। কিন্তু অনেক জায়গায় তাঁর সঙ্গে একমত হতে না পারায় বিস্তৃত সমালোচনাও আছে এই লেখায়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

পরিবেশ, জলবায়ু, বহুজাতিক কোম্পানি, করপোরেট পুঁজি, প্রতিবেশ, আন্দোলন

ভূমিকা

পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে পরিবেশ-প্রতিবেশ বাঁচাতে হবে—এ বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষই একমত। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসে থাকা বেশির ভাগ ডানপন্থী, রক্ষণশীল, জনতুষ্টিবাদী ও কর্তৃত্ববাদী শাসক পরিবেশবান্ধব নন। এর কারণ, তাঁরা সবাই ব্যবসাবান্ধব। আর ব্যবসায়ী করপোরেশনগুলো তাদের করপোরেট পুঁজির বলে এসব নেতার ক্ষমতায় আসা এবং টিকে থাকা পাকাপোক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প, রাশিয়ায় পুতিন, ভারতে মোদি, যুক্তরাজ্যে জনসন, চীনে চিন পিং, জাপানে আবে, ব্রাজিলে বলসোনারো—লম্বা এক তালিকা। এসব নেতা ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের অনুসারী হলেও বড় মিলের জায়গা হলো জনতুষ্টিবাদ তাঁদের ক্ষমতায় আসার পেছনে বড় নিয়ামক। উন্নত বিশ্বে বর্তমান জনতুষ্টিবাদী ঢেউয়ের মূল জোগান আসছে জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে। তাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে জাতীয়তাবাদের।

পাশাপাশি হাইপার গ্লোবালাইজেশন বা অতিমাত্রিক বিশ্বায়নের যেখানে লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পথে বাধাগুলো কমানোর, সেখানে ঘটেছে উল্টো যাত্রা। ক্রমাগত চাকরির খরা, মজুরি কমে যাওয়া এবং বিশ্বব্যাপী আয়বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা হয়েছে আরও বেশি অস্থিতিশীল। ফলে, ঘন ঘন আর্থিক সংকট লেগেই আছে। এসব সমস্যাই জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির পালে হাওয়া দিচ্ছে জোরেশোরে।

সমস্যা হলো শুধু উন্নত দেশগুলো নয়, উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতেও জেঁকে বসেছে জনতুষ্টিবাদী রক্ষণশীল ঘরানার কর্তৃত্ববাদী শাসন। ফলে, মানুষের দুর্ভোগ হয়েছে হরেক রকম। মৌলিক অধিকার খর্ব করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংস করাও এসব শাসকের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অনুঘটক।

ভারতে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পেছনে যেমন রয়েছে করপোরেট স্বার্থ ও জনতুষ্টিবাদী রাজনীতি, তেমনি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণের আধার আমাজন বনে আগুন লাগানোর পেছনেও রয়েছে ব্রাজিলের ব্যবসাবান্ধব প্রেসিডেন্টের পরিবেশবিনাশী নীতি। যুক্তরাষ্ট্রের জীবাশ্ম জ্বালানিবান্ধব প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বাসই করেন না। বিশ্বের বড় বড় ব্যাংকসহ পুরো আর্থিক ব্যবস্থাই জীবাশ্ম জ্বালানির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীদের বড় অংশই জীবাশ্ম জ্বালানি খাতের বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ী। তাঁদেরই বন্ধুপ্রতিম নেতা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে প্রধান কারণ যেহেতু জীবাশ্ম জ্বালানি, তাই এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থান আঁচ করা কঠিন কিছু নয়। কারণ, জ্বালানি শিল্পের অধীনে নবায়নযোগ্য বা বিকল্প জ্বালানিকে দেখা হয় জীবাশ্ম জ্বালানির সম্পূরক হিসেবে, বিকল্প হিসেবে

নয় (York, 2012)। সম্প্রতি ডেনমার্কের দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড কিনতে চাওয়ার পেছনেও রয়েছে ট্রাম্পের সেই ব্যবসায়িক কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলে পর্যটনশিল্প ও খনিজ সম্পদের দুয়ার উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায় (Barkham, 23 Dec, 2016)। সেটাই ট্রাম্পের দ্বীপ কিনতে চাওয়ার শখের পেছনে মূল কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব দেশ ও মানুষ। ট্রাম্পের মতো অনেকের তাতে ক্ষতির চেয়ে যে লাভ বেশি, এগুলো তারই প্রমাণ।

পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংসের পেছনে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সম্পর্কের ভিত্তি হলো প্রভু-ভৃত্য বৈশিষ্ট্য। কাঁচামাল আহরণ থেকে উৎপাদন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত সব স্তরেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পরিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। আর তার শুরু সেই ঔপনিবেশিক সময় থেকেই। এখান থেকেই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশের ধারণা এসেছে। পরিবেশের ওপর এসব কোম্পানির নেতিবাচক প্রভাব কমাতে রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতা নিয়েও অনেক কাজ হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় রাষ্ট্রগুলোর এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো করপোরেট পুঁজির ক্ষমতা। তাই একে অনেকাংশে বলা যায় রাষ্ট্রগুলোর সচেতন অসচেতনতা অথবা সক্রিয় নিষ্ক্রিয়তা। আবার গায়ত্রী স্পিভাকের সুরে বলা যায় 'স্যাংকশন্ড ইগনোরেন্স'। কারণ, কৌশলগত কারণেই রাষ্ট্রগুলো পরিবেশের ওপর বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর নেতিবাচক প্রভাব বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আর কী সমাধান থাকতে পারে? উত্তর হলো, রাষ্ট্রই এখানে প্রধানতম শক্তি, যে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প রিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব কমাতে পারে। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক না হওয়ায় মুষ্টিমেয় লোকই নীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব রাখে। আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তি হলো সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যাঁরা আছেন, তাঁদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ। ফলে, রাষ্ট্রকে বাধ্য করাতে দরকার গণতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলন।

পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন নিয়ে রয়েছে বিস্তৃত অনেক গবেষণা ও গ্রন্থ। তবে এই প্রবন্ধের নজর থাকবে পরিবেশের ওপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নেতিবাচক প্রভাব কমাতে রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

যে চোখে দেখতে চাই

ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার। পুঁজিবাদ এমন এক ব্যবস্থা, যা তৈরিই হয়েছে অসীম পুঁজি আহরণ বা পুঞ্জিভবনের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো, যাকে বলা

হয় এক্সপোনেনশিয়াল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানে সময়ের আবর্তে ক্রমাগত এই প্রবৃদ্ধি অঙ্কের হিসাবে বাড়তে থাকবে। পরিবেশ-প্রতিবেশের অবনতির ফলে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী আজ যেই সংকটের মুখোমুখি, সেখানে পুঁজিবাদের এই এক্সপোনেনশিয়াল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দায় কতটুকু, তার বিস্তৃত ও গোছানো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে জন বেলামি ফস্টারের কাজে। এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *দ্য ভালনারেবল প্লানেট : আ শর্ট ইকোনমিক হিস্ট্রি অব দ্য এনভায়রনমেন্ট* (১৯৯৪), *ইকোলজি অ্যাগেইনস্ট ক্যাপিটালিজম* (২০০২) এবং ব্রেট ক্লার্ক ও রিচার্ড ইয়র্কের সঙ্গে মিলে লেখা *দ্য ইকোলজিক্যাল রিফট : ক্যাপিটালিজম'স ওয়ার অন দ্য আর্থ* (২০১০)।

ফস্টারের কাজ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে যদি বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ হয়, তাহলে এক শতকে অর্থনীতির পরিধি বাড়বে ১৬ গুণ, দুই শতকে বাড়বে ২৫০ গুণ এবং তিন শতকে তা বাড়বে ৪ হাজার গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে পৃথিবী গ্রহের যে সক্ষমতা, বিশেষ করে এর সহ্যসীমা, সম্পদের সীমা, হজম করার ক্ষমতা বা সিংক এবং বর্জ্য গ্রহণের সীমা মূলত একই থাকবে। সে কারণে প্রতিবেশের সীমার ওপর অর্থনীতি যে চাপ তৈরি করছে, সেই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীনে যতই নীতি প্রণয়ন করা হোক বা জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ে সম্মেলন ও আলোচনার নামে ঘষামাজা করা হোক না কেন, পৃথিবী গ্রহের যে সীমা, যাকে বলা হচ্ছে প্ল্যানেটারি বাউন্ডারি, মানুষ তা ক্রমাগত অতিক্রম করতেই থাকবে।

তবে সমস্যাটা এর চেয়ে বেশি গুরুতর। সমস্যা আরও জটিলতর হয়, যখন পুঁজিবাদ তার গতি আইন বা ল অব মোশন পরিবেশের ওপর চাপিয়ে দেয়। সেখানে এই গ্রহের জীব ও পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক চক্র এবং পৃথিবীর মেটাবলিজম বা বিপাকের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এর ফলে আর্থ সিস্টেমের বায়োজিওকেমিক্যাল চক্রে তৈরি হয় রিফট বা ফাটল। আর এই ফাটল বাস্তুতন্ত্রকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গাণিতিক যুক্তি দিয়ে সারানো সম্ভব নয়। একেই কার্ল মার্ক্স বলেছেন মেটাবলিক রিফট বা বিপাকীয় ফাটল। এই ধারণা সমৃদ্ধ করেছেন জন বেলামি ফস্টার তাঁর *মার্ক্সেস ইকোলজি : ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড নেচার* (১৯৯৯) গ্রন্থে। জাপানি পণ্ডিত কোহেই সাইতো তাঁর *কার্ল মার্ক্স'স ইকোসোশ্যালিজম : ক্যাপিটাল, নেচার অ্যান্ড দ্য আনফিনিশড ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি* (২০১৭) গ্রন্থেও এই মেটাবলিক রিফট ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্ক্সের আদি নোটবুকগুলো ঘেঁটে। এই রিফট বা ফাটলই পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বিশ্বনেতাদের প্রতিটি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তে টেকসই উন্নয়নের ধারণা বলি দেওয়া হচ্ছে

ক্রমাগত। ফলে, সভ্যতা ও জীবন দুটোই হুমকির মুখে পড়ছে প্রতিনিয়ত।

মার্ক্সের বিপাকীয় ফাটলের তত্ত্ব বা 'সামাজিক বিপাকের আন্তনির্ভরশীল প্রক্রিয়ায় অপূরণীয় ক্ষতিসাধন' তত্ত্ব (Marx, 1981, p. 949) ছিল পদ্ধতিগতভাবে প্রতিবেশিক সংকটের সামাজিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম বিশ্লেষণ। সেখানে একই সঙ্গে সমাজ ও প্রকৃতি এবং তাদের দ্বান্দ্বিক আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছিল এবং তা উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। মার্ক্সের এসব দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে বর্তমানেও পৃথিবী গ্রহের সংকট দেখার জন্য সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

এখন যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এনথ্রোপসিন বা মনুষ্য যুগের কথা বলা হয়, তখন নির্দিষ্ট করেই বলা হয় যে ১৯৪৫ সাল থেকে পৃথিবী গ্রহের ওপর মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাবের মাত্রা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার ফলে আর্থ সিস্টেমে এক মনুষ্যযুগীয় ফাটল সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে ইতিহাসের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলো থেকে বর্তমান পর্যায় চিরতরে আলাদা হয়ে পড়ছে প্রতিবেশিক ও বাস্তুতান্ত্রিকভাবে। মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কে এই ফাটল ইতিমধ্যে ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। শিগগিরই তা এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। আরও পরিষ্কার করে বললে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেলেই আরও ভয়ানক দুর্যোগ আমাদের সামনে হাজির হবে। তখন সমগ্র মানবজাতিই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিজ্ঞানীই এই বিষয়ে একমত (Cook et. al, 2013)। তাঁদের মতে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর বেশি হবে। গণমাধ্যম থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—সব জায়গাতেই কমবেশি এসব আলোচনা হচ্ছে এবং সবাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত।

মিশেল ফুকোর দৃষ্টিভঙ্গির অনুরণনে ক্রিটিক্যাল ঘরানার পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন কীভাবে 'সম্পদ আহরণ নিয়মের শাসন বা রেজিম অব রুলের অংশ। এই নিয়মের শাসনে যুক্ত হয় প্রযুক্তি, যৌক্তিকতা আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যা বোধগম্য করা হয় সত্যের শাসনের মাধ্যমে। এই সত্যের শাসনই মানুষের উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতার বিন্যাস তৈরি করে' (Rose, *cited in Baviskar*, 2003, p.50-51)। বর্তমান দুনিয়ার ডানপন্থী শাসকদের পৃথিবীব্যাপী সম্পদ আহরণের চিত্র দেখলে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। প্রযুক্তি, যৌক্তিকতা আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জোরে যেকোনো মূল্যে সম্পদ আহরণে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে বরফ গলিয়ে খনিজ-তেল-পেট্রোলিয়াম আহরণই হোক, বা বন উজাড় করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে জলবায়ু পরিবর্তন আর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করেই হোক।

এটা প্রতিষ্ঠিত যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও দুর্ভোগ সহ্য করার দায় গিয়ে পড়ে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বনজীবী মানুষ, ছিন্নমূল মানুষ, যেমন বাঁধের ওপর অস্থায়ী ঘর বেঁধে যারা থাকছে, এবং সর্বোপরি সব শ্রেণির নারীরা। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব নেই। থাকলেও সেগুলো নামকাওয়াস্তে লোকদেখানো এনজিও কার্যক্রমের অংশ। টেরি (২০০৯) দেখিয়েছেন কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ধরাবাঁধা 'পুরুষালি' ডিসকোর্সের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। জলবায়ুসংক্রান্ত আলোচনার মূল বিষয়ই হলো নতুন প্রযুক্তি, বড় বড় অর্থনৈতিক প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি এবং কম্পিউটার মডেলিংয়ের মাধ্যমে দুর্বোধ্য সব সমাধান বাতলে দেওয়া, যা জনসাধারণের উপলব্ধির বাইরে। লিঙ্গভেদে কীভাবে এই সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে, সে আলোচনা এসব সমাধানে অনুপস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তন ধনীর চেয়ে গরিবকে, পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশি প্রভাবিত করে। কিন্তু তার কোনো হদিস জলবায়ু পরিবর্তনের ধরাবাঁধা ডিসকোর্সে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৈশ্বিক জলবায়ু সমস্যার সমাধানের মূল জায়গা হলো বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলে ফেলা। জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর অর্থনীতির বদলে নবায়নযোগ্য টেকসই জ্বালানির অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটানো। কিন্তু টেকসই জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণের এই প্রক্রিয়া ঘিরে নব্য উদারনীতিবাদের 'গ্রিন গ্রোথ' বা সবুজ প্রবৃদ্ধি আখ্যানের সমস্যা হলো অন্যখানে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্দেশ্যে যেসব নীতি-পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো যে বিভক্তি ও বৈষম্যের পূর্ববর্তী নীতিগুলোরই অনুকরণ, তা নতুন এই সবুজ প্রবৃদ্ধি আখ্যানে স্বীকার করা হয় না (এ বিষয়ে দেখুন Bumpus and Liverman 2008, 2011; Buscher and Fletcher 2015; Fairhead et al. 2012)।

এ বিষয়ে এরিকসন (২০১৮, পৃ.৩) সবাধানবাণী শুনিয়ে বলেছেন, 'এনথ্রোপসিন বা মনুষ্য যুগের ডিসকোর্স এবং ঔপনিবেশিক পরিবেশবাদ, দুটোই সামাজিক পার্থক্যগুলো অস্পষ্ট করে দিতে সংকট সৃষ্টি করে...দুটোই পরিবেশ ধ্বংসের হুমকির মাধ্যমে বর্ণবাদ আচ্ছন্ন অধিক্ষেত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করে।' নব্য উদারনীতিবাদী জলবায়ু 'সমাধান', যেমন কার্বন বাণিজ্য ও কার্বন কমানোর (কার্বন অফসেটিং) প্রকল্পগুলো চালু করতে যে ধরনের বিমূর্ত অবস্থা ও ভারসাম্য দরকার, সেগুলোকে লোহম্যান (২০০৮) সমালোচনা করে বলেছেন অজ্ঞতার উৎপাদন। কারণ, এসব উদ্যোগে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হচ্ছে না। শুধু বাজারনির্ধারিত সার্বজনীন মূল্যের ম্যাট্রিক্স দিয়ে স্থানীয় জ্ঞান,

অভিজ্ঞতা, ও অগ্রাধিকারকে বদলে দেওয়া হচ্ছে (এ বিষয়ে আরও দেখুন Bracking 2015; Corbera and Brown 2010) । তানিয়া লি (২০১৪) ইন্দোনেশিয়ার প্রেক্ষাপটে ভূমি বিনিয়োগ ও সম্পত্তির নিয়মকানুন বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে নব্য উদারনীতিবাদের এসব কর্মসূচিকে বলেছেন ইনসক্রিপশন ডিভাইস বা খোদাই করার যন্ত্র। তাঁর ভাষায় এগুলো হলো, 'কোনো কিছু দেখা, গণনা করা, শ্রেণিভুক্ত করা এবং পেশ করার পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কিছু জিনিস স্পষ্ট হয়, কিন্তু অন্যগুলো উধাও করে দেওয়া হয়' (Li, 2014, p. 594)। শাসক ও পুঁজিবাদী ক্ষমতার এসব চিত্রের উৎস রয়েছে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট সময়ের তত্ত্বের মধ্যেই। একে গায়ত্রী স্পিভাক (১৯৯৯) বলেছেন স্যাংকশন্ড ইগনোরেন্স বা অনুমোদিত অজ্ঞতা। এই সজ্ঞান অজ্ঞতার মানেই হলো আধিপত্যবাদবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার নিষ্ক্রিয় সমাপ্তি। জ্ঞানের ছাঁকুনি এমনভাবে তৈরি করা, যা আসলে ঔপনিবেশিক কাঠামোরই পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এর ফলে ইউরোসেন্ট্রিক যে আধিপত্যবাদী চিন্তাজগৎ, তার বাইরে ভিন্নমত জন্ম নিলে তা চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।

বর্তমানের জলবায়ুসংকট আসলে ঔপনিবেশিক সময় থেকে চলমান শোষণ ও বৈষম্যেরই ধারাবাহিকতা। ইমপেরিয়াল ইকোলজি বা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশ স্থাপন এই সংকটের সূচনাবিন্দু বলা যায় (ইমপেরিয়াল ইকোলজি ধারণার জন্য দেখুন Foster, 1994)। তাই জলবায়ু-ন্যায্যতার প্রশ্নে সেই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই চলতে হবে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর শোষণ চালানোর বাহন ছিল ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলো, যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এখনো সে রকম বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। উপমহাদেশের সম্পদ পাচার করে ব্রিটিশরাজ শিল্পবিপ্লবে কাজে লাগিয়েছে (বিস্তারিত দেখুন, এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, ২০১৪)। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পবিপ্লবেও ইয়াকিং বণিকদের বাংলা থেকে প্রাপ্ত ব্যবসায়িক মুনাফাই ছিল মূল জোগান (বিস্তারিত দেখুন সিরাজুল ইসলাম, ২০১৪)।

শিল্পবিপ্লবের কাঁচামাল নিশ্চিত করতে গিয়ে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশসহ অন্যান্য স্থানে চালিয়েছে শোষণের শাসন। আর আজ সেই শিল্পবিপ্লবের ফলাফল হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, যার দুর্ভোগ পোহানোর দায়ও ভারতীয় উপমহাদেশের মতো দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর। সেই সাবেক কলোনিগুলোই আবারও জলবায়ু প্রশ্নে পড়েছে নিষ্পেষণের জাঁতাকলে। আর এবারও এর পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। পল গ্রিফিন (২০১৭) দেখিয়েছেন যে বিশ্বের মাত্র ১০০টি বহুজাতিক কোম্পানিই ৭০ শতাংশের বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে। এদের বলা হচ্ছে 'কার্বন মেজরস'। এক্সন মবিল, শেল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ও

শেভরন এই তালিকার সবার ওপরে (Griffin, 2017)।

অথচ প্যারিস জলবায়ু চুক্তির চার বছর পরও পৃথিবীর বড় কোম্পানিগুলোর পাঁচ ভাগের চার ভাগই চুক্তির লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হতে চলেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৩ হাজার নিবন্ধিত কোম্পানির মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ বৈশ্বিক তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। বাকিরা বিনিয়োগ হারানোর ভয়ে তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের চিত্র প্রকাশ করছে না (Ambrose, Sept, 2019)। তাই বর্তমানে পৃথিবী ধ্বংসে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকা বুঝতে হলে, এর ফলাফলে ভুক্তভোগী কারা সেটা বুঝতে হলে এবং এর সমাধানে করণীয় খুঁজতে হলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। রাষ্ট্র যেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে আশার বাণী শোনাতে পারে এসব অন্যায্যতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণআন্দোলন। তার ভবিষ্যৎ দেখাটাও তাই জরুরি।

এসব বিবেচনায় দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো কীভাবে পৃথিবী ধ্বংসের এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখানো, আর দ্বিতীয়টি হলো এর বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন বা প্রতিবাদ দানা বাঁধতে না পারার কারণ।

সম্প্রতি কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক পিটার ডওভারনের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নতুন বইতে তিনি লিখেছেন বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে কি না, এই নিয়ে। এই প্রশ্নই বইয়ের শিরোনাম। যা হোক, যে সমাধান তিনি দিয়েছেন, সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে পৃথিবী ধ্বংস করছে, তার যে বিশ্লেষণ ডওভারন দিয়েছেন, তা প্রত্যেক পৃথিবীবাসীরই জানা দরকার।

কিন্তু ডওভারনের সমাধানের সঙ্গে একমত হতে পারা কঠিন। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজতে গিয়ে ডওভারনেরই আরেকটি বইয়ের সন্ধান মেলে। তবে তা যৌথভাবে লেখা, আর সেটা ২০১৪ সালের। সাধারণত ভাবা হয় যে বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে হয়তো পৃথিবীকে বাঁচানো যাবে। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীকে বাঁচানোর ব্যাপারে সম্প্রতি লেখা অন্যতম সাড়া জাগানো বই নাওমি ক্লেইনের (২০১৪) *দিস চেঞ্জেস এভরিথিং : ক্যাপিটালিজম ভার্সেস দ্য ক্লাইমেট*। সেখানে পুরো একটি অধ্যায়জুড়ে তিনি দেশে দেশে কীভাবে করপোরেশনগুলোর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোকে তিনি বলছেন ব্লক্যাডিয়া।

গত দশকেই কয়লার বিরুদ্ধে আন্দোলন জেগে উঠতে থাকে। এখন সেটা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এসব আন্দোলনে নির্দিষ্ট অবকাঠামো, যেমন খনি, বন্দর, রেলপথ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। এর বাইরেও যেসব

আর্থিক প্রতিষ্ঠান জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পকে ঋণ দেয়, সেগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। বাংলাদেশের ফুলবাড়ীতে ২০০৬ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দরবনের পাশে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজপথ—সবখানেই আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। বিশ্বব্যাপী চলমান এসব আন্দোলনে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও উত্তেজনা দেখা যায়। বাধা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিকূলতা মোকাবিলার কৌশল গ্রহণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রথাগত মডেলকে বোকা বানিয়ে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন আন্দোলন মিলে এক বৃহত্তর আন্দোলনের জ্বালামুখ সৃষ্টি করেছে। এগুলোকেই নাওমি ক্লেইন বলেছেন ব্লক্যাডিয়া (ব্লক্যাডিয়ার ধারণার জন্য দেখুন Klein, 2014; Brown and Spiegel 2017, Martinez-Alier et al. 2016)।

তবে এসব গণজমায়েতকে শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের চোখ দিয়ে দেখলে হবে না। এই স্ফুলিঙ্গগুলোয় আগুন লাগছে, কারণ, মানুষ বহুমুখী দুর্দশায় জর্জরিত। এর ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন করে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। যেমন কাইজার ও ক্রনসেল (২০১৪, ৪২২) প্রশ্ন রেখেছেন, 'কোন কোন পরিচয় সামনে আনা হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এসব প্রকল্পে কোন পরিচয়গুলো অদৃশ্য হয়ে পড়ে?' নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট কিছু পরিচয়কে কৌশলগতভাবে সামনে আনা হয়। জলবায়ু-ন্যায্যতার সমর্থক, যাঁরা একটি বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্দোলন গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

ডওভারন গণ-আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের যৌথভাবে লেখা *প্রটেস্ট ইনক* (২০১৪) বইয়ে। মূল কথা ছিল করপোরেশনগুলো সামাজিক আন্দোলনকেও তাদের করপোরেট পুঁজির অংশ করে ফেলেছে। আর তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ভয়ে। সেই বইয়ে সব মিলিয়ে আন্দোলনের ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে এক হতাশার চিত্র।

কিন্তু পৃথিবী ও পরিবেশকে বাঁচাতে হলে গণতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলনের আর বিকল্প নেই। তবে প্রথাগত সামাজিক আন্দোলন যে আর চলবে না, সেটাও পরিষ্কার। তার আগে দেখা যাক পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নে বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান।

বড় ব্যবসায়ীরা কি আমাদের পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন?

পত্রপত্রিকায় লেখাজোখা ও অন্যান্য গণমাধ্যমের কল্যাণে আমরা সবাই কমবেশি জানি যে পৃথিবী নিজেই অস্তিত্বসংকটে ভুগছে। বছরের পর বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। প্রতিবছরই তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড হচ্ছে। সমুদ্র

উত্তপ্ত করা সেই তাপমাত্রার কারণে অকল্পনীয় বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে, যার গতি প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হচ্ছে। সৃষ্টি করছে ঘূর্ণিঝড় আর বনজঙ্গল পুড়ছে দাবানলে। মাছের মজুত ধ্বংস হচ্ছে, প্লাস্টিকের কারণে পরিযায়ী পাখিরা আক্রান্ত হচ্ছে সমুদ্রে। শিল্প-কারখানার বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে সব ধরনের জলস্তর। এই শতকের মধ্যভাগে ৬০ শতাংশ প্রধান স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী বিলুপ্তির মুখে পড়বে। পিটার ডওভারন (২০১৮) *উইল বিগ বিজনেস ডেস্ট্রয় আওয়ার প্লেনেট?* শিরোনামের বইয়ে এসব বিষয়ে আলোকপাত করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন: দোষ কার? বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে শাসনপ্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। তারা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের এজেন্টই নয়, পরিবেশ বিপর্যয়ের এজেন্টও। এই 'দোষ কার' প্রশ্নের উত্তর কি তাহলে 'বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান' হবে?

তবে বৈশ্বিক বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর প্রধান নির্বাহীদের বক্তব্য শুনলে মনে হবে, তাঁরা দায়ী নন। যেমন কোকাকোলার প্রধান নির্বাহী এই বইয়ে পিটার ডওভারনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে 'টেকসই পরিবেশের ধারণাই আমাদের অগ্রযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু'; অথবা পেপসিকোর প্রধান নির্বাহী যেমনটা বলেছেন যে 'বিশ্বে পার্থক্য গড়ে দেওয়া' তাঁদের দায়িত্ব (Dauvergne, 2018, p. 3)। এমন সব বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধির ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে ডওভারন চলে গেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে বহুজাতিক ব্যবসার সঙ্গে অতীতে বৈশ্বিক সামাজ্যবাদ বিস্তারের সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০০ সালে। একইভাবে ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০২ সালে, ডাচ্ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬২১ সালে আর ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। এই কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি ১৬৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হাডসন বে কোম্পানি মিলে পৃথিবীব্যাপী হরিলুট চালিয়েছে। ক্রীতদাস, মসলা, সুতা, সিল্ক, চা, কাঠ, চামড়া, সোনা, রুপা ও আফিমের খোঁজে তারা হরণ করেছে দরিদ্র দেশগুলোর সম্পদ। একই সঙ্গে ছড়িয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আর নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে।

তবে আধুনিক বহুজাতিক কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়েছে বিশ শতকের শুরুর দিকে। ১৯২৯ সালে সাবান প্রস্তুতকারক লিভার ব্রাদার্স একীভূত হয় মারগারিন ইউনি কোম্পানির সঙ্গে। এর মাধ্যমেই যাত্রা শুরু ইউনিলিভারের। সে সময়ে এই একীভূত হওয়ার ঘটনা ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এই সময়েই উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে। এই কালকে বলা হয়ে থাকে ফরডিজম (ফরড কোম্পানির নামানুসারে)। তখন উৎপাদন শুরু হয় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। উদ্দেশ্য ছিল কম খরচে বিপুল উৎপাদন নিশ্চিত করা। যেমন ১৯০৬ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফরড কোম্পানির টি মডেলের গাড়ির উৎপাদন দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়নে।

যুদ্ধের পর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সংখ্যা বেড়ে যায় বহুগুণে। ম্যাকডোনাল্ডস করপোরেশন যাত্রা শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। এই খাতে আরও যুক্ত হয় সাবওয়ে, কেএফসি, বার্গার কিং ও পিৎজা হাট। এসব করপোরেশন মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ফেলেছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। হেনরি ফোর্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওয়ালমার্ট ১৯৬২ সালে আরকানসাসে তাদের দরজা উন্মুক্ত করে। এখন তারা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। ওয়ালমার্ট আয়ের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ কোম্পানির চেয়েও তাদের আয় ১৭০ বিলিয়ন ডলার বেশি। এসব করপোরেশন তাদের বিজ্ঞাপনের জোরে আর প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের জীবনপ্রণালির মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদলে দেওয়ার মাধ্যমে তারা সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর মালিক ও শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব সম্পদও ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই সম্পদের গুণেই তারা রাজনৈতিক প্রভাব ও আনুকূল্য কিনে নেয়। এর ফলে এনজিওগুলোর করপোরেটাইজেশন ঘটে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে কোকাকোলা বা ওয়ালমার্টের মতো বড় ব্র্যান্ডগুলো বিখ্যাত এনজিওগুলোর প্রধান স্পনসর। অথচ এসব ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলোর রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন দমন এবং শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো নামকাওয়াস্তে মজুরি প্রদানের ইতিহাস। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব বহুজাতিক কোম্পানি গণদাবির মুখে এবং শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখতে বাধ্য হয়। এভাবেই করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআরের ধারণা জন্ম নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দুই পক্ষের জন্যই একটা লাভজনক অবস্থা তৈরি করা (Dauvergne, 2018, p. 39)।

বহুলাংশে এই সিএসআর একটি গণসংযোগ কৌশল। উদ্দেশ্য হলো সমালোচনা শান্ত করা আর এমনভাবে করপোরেশনের অভ্যাস বদলানো, যেন প্রবৃদ্ধি ও মুনাফার মতো প্রধান বিষয়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ডওভারন এই ধারণাকে বলছেন 'ইকো-বিজনেস'। জেন লিস্টারের সঙ্গে মিলে ডওভারন এই ধারণা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের *ইকো-বিজনেস* শিরোনামের বইয়ে। ইকো-বিজনেসের ধারণা দিতে গিয়ে ডওভারন বলেন, 'বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের মধ্যে যেসব ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আছে, তার ব্যবস্থাপনার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপই ইকো-বিজনেস (Dauvergne, 2018, p. 43)।'

সহজেই বোঝা যায় যে এখানে ঝুঁকি বলতে বোঝানো হচ্ছে সম্ভাব্য মুনাফার জন্য ঝুঁকি, যা নেতিবাচক ভাবমূর্তির কারণে আসতে পারে। তাই এটা পরিষ্কার যে বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর পরিচালনা পদ্ধতিতে পরিবেশের টেকসইত্ব ও

নৈতিকতার বিষয়গুলো পূরণ করার মাধ্যমে তারা আসলে নির্দিষ্ট ক্রেতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। আবার একই সঙ্গে নিজেদেরও আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে। মজার ব্যাপার হলো, এসব কোম্পানিই আবার ফরেস্ট স্টুয়ার্ডশিপ কাউন্সিল, মেরিন স্টুয়ার্ডশিপ কাউন্সিল ও রাউন্ডটেবিল অন সাসটেইনেবল পাম অয়েলের মতো সংগঠনগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। এই সংগঠনগুলোই বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর আচরণবিধি অনুযায়ী পণ্যের সনদ প্রদান করে থাকে। ডওভারন এসব ঘটনা বলতে গিয়ে বলেছেন, ব্যাপারটা এ রকম যে অগ্নিসংযোগকারীর হাতেই আগুন নেভানোর দায়িত্ব দেওয়া।

এ কথা যে কত সত্য, তা দু-একটা উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে। এসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক কর ফাঁকি চক্রান্তের মতো অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। যেমন অ্যাপল কোম্পানির আয়ারল্যান্ড শাখা তাদের মুনাফা সরিয়েছে, কিন্তু কর দিয়েছে মাত্র ০.০০৫ শতাংশ। সে জন্য তাদের জরিমানা হয় ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপীয় ইউনিয়নে গুগল ও মাইক্রোসফটের একচেটিয়া আচরণ সেই একই কাজ করেছে এবং একই পরিণতি হয়েছে। কিন্তু তারপরও দেখা গেছে, টানা তিন বছর গুগল পৃথিবীর সবচেয়ে দায়িত্বশীল কোম্পানি হিসেবে ভোটে নির্বাচিত হয়েছে।

অনেক সময়ই শুধু সামাজিক প্রভাব নয়, পরিবেশগত প্রভাবও থাকে। যেমন ভক্সওয়াগন ডিজেল নির্গমন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি করেছে। ফলে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ঢুকেছে হিসাবের বাইরেও। আবার ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম যখন তেল ফেলছে, সেটা উপকূলীয় বন্য প্রাণী ও মানুষ, সবাইকেই বিপদের মুখে ফেলছে। এসব ক্ষতি কিন্তু এই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোর কারণেই ঘটছে। কিন্তু বলা হয় যে এগুলো আচরণগত বিষয় অথবা অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি।

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে পিটার ডওভারন তাঁর শুরুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু সেটা বেশ আশ্চর্জনকই বটে। বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা করপোরেশনগুলো আমাদের পৃথিবী ধ্বংস করবে কি না বলে যে প্রশ্ন দিয়ে তাঁর বই শুরু হলো, তার উত্তরে তিনি বলছেন 'না'। মানে বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের পৃথিবী ধ্বংস করবে না। তাঁর মতে, 'বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আত্মসংবরণই সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন ঠেকাবে' (Dauvergne, 2018, p. 97)। ডওভারন নির্ভর করেছেন দক্ষতার ধারণার ওপর। তাঁর মতে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন, পরিবহন ও মালামাল বিতরণের জন্য ক্রমাগত নতুন ও অধিক দক্ষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

কিন্তু ডওভারনের এই সমাধান যে কার্যকর নয়, সে প্রসঙ্গে জেভনস প্যারাডক্সের কথা বলা যায়। ১৮৬৫ সালে অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভনস পর্যবেক্ষণ

করেন যে, 'জ্বালানির মিতব্যয়ী ব্যবহারের মানে হলো হ্রাসকৃত ভোগ। কিন্তু ব্যাপারটা ধারণার সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থা। কারণ, সম্পূর্ণ বিপরীতটিই এখানে সত্য' (Jevons, 1865, p. 123)। এই প্যারাডক্সের মূল কথা ছিল যখন কোনো সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তখন সেই সম্পদের সামগ্রিক ভোগ বৃদ্ধি পায়। জেভনস তাঁর *কোল কোয়েশ্চেন* গ্রন্থে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন উন্নত হওয়ার ফলে প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার ব্যবহার কমেছে। কিন্তু একই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে, কারণ, আরও অনেক বেশি কলকারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। সে কারণেই কয়লার ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কয়লার সামষ্টিক ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডওভারনের শেষ ভরসা এ রকম যে প্রবৃদ্ধিকে বস্তুগত ভিত্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা সম্ভব। এর ফলে প্রবৃদ্ধিও হবে, আবার পরিবেশও অক্ষত থাকবে। কিন্তু তিনি যেটা এড়িয়ে গেছেন, তা হলো পুঁজিবাদের পদ্ধতিগত যুক্তি। বিষয় হলো সারপ্লাস ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ প্রকৃতি ও শ্রম দুটোর ওপরই নির্ভর করে। ফলে, যেসব পণ্য সে উদ্‌গত করে দিচ্ছে, সেখানেও প্রচ্ছন্ন সম্পদ ও শ্রম রয়েছে। সেসব তখন পৃথিবীব্যাপী অসমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে ডওভারন বলছেন 'ইকোলজিক্যাল শ্যাডোস' বা প্রতিবেশিক ছায়া। এখান থেকেই লেখকের বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুমান করা যায়। তিনি আসলে ব্যবসা ও বাজারের বিশ্লেষণ করেছেন বিমূর্ত আকারে, যার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক বিযুক্ত থেকে গেছে।

আলোচিত প্রশ্নের 'না'-সূচক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ আন্দোলনের ওপর ডওভারনের আস্থা আরেকটি কারণ। তবে তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থা বদলের কথা না বলে ভরসার সবটুকু রেখেছেন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ওপর। তিনি লিখেছেন, 'ভবনগুলো পানি, বর্জ্য, জ্বালানি ও কার্বন নির্গমনের মানদণ্ড মেনে চলছে, রাজপথগুলো আগের চেয়ে বেশি স্থায়ী হচ্ছে এবং সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাণিকুলের আবাস বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে' (Dauvergne, 2018, p. 101)। তিনি আরও লিখেছেন, লন্ডনের মতো উন্নত শহরগুলোয় দূষণ কমছে।

ডওভারনের এই যুক্তি বিনা বিচারে মানা যায় না। ব্যাপারটা হয়ে গেছে প্রযুক্তিগত ফেটিশিজমের মতো। দার্শনিক রেনে দেকার্তের কার্টেসিয়ান লজিক থেকে যে আমরা নিজেদের দূরে রাখতে পারছি না, এটা তারই প্রমাণ। কার্টেসিয়ান লজিক অনুযায়ী সামাজিক ক্ষেত্র বস্তুগত ক্ষেত্র থেকে আলাদা। ডওভারনের বইয়ে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, প্রযুক্তিকে সরলভাবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। প্রযুক্তিও পুঁজি পুঞ্জভবনের আরেকটি কৌশল ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এর ভিত্তি হলো সম্পদের অসম বিনিময়ব্যবস্থা।

পরিবেশগত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে ডওভারন লন্ডনকে বেছে নিয়েছেন। এটা হয়তো কোনো দৈব ঘটনা নয়। তিনি সেটা স্বীকারও করেছেন এক উক্তির মাধ্যমে: 'যখন সরকার বা ফার্মগুলো কোনো সমস্যা সমাধানের কথা বলছে, তখন তারা বস্তুত বিদ্যমান সমস্যাটা অন্য কোনো সমস্যার আওতায় ফেলে দিচ্ছে অথবা ভবিষ্যতের কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে' (Dauvergne, 2018, p. 105)। এর ফলে তাঁর উপসংহার হয়েছে আরও বেশি দ্বিধাগ্রস্ত ও স্ববিরোধী।

ডওভারন আসলে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও করপোরেট নৈতিকতার ওপর খুব বেশি আস্থা রেখেছেন। এককথায় বলা যায়, বইটি সঠিক পথেই ভুল কদম ফেলেছে। এখানে টেকসই পরিবেশের ব্যাপারে করপোরেট প্রচেষ্টার দ্বৈতনীতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শেষমেশ, যারা আগুন লাগায়, তাদের হাতেই আগুন নেভানোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটি বুঝতে হলে সমগ্র বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক ক্রিটিক্যালি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশ

গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন নিয়ে বিতর্ক এই প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই রয়েছে। বিশ্বায়ন ভালো কি খারাপ—এ নিয়ে দুই পক্ষেরই রয়েছে শক্তিশালী সব যুক্তি। কিন্তু সহজ কথায় বলতে গেলে বিশ্বায়ন ভালোও নয়, খারাপও নয়। নোয়াম চমস্কি যেমন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন বিশ্বায়ন কীভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে এটা ভালো, না খারাপ। বিভিন্ন ধারণা, উদ্ভাবন, নান্দনিক কাজকর্ম বিনা মূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া বা মানুষের অবাধ বিচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের রয়েছে ইতিবাচক অবদান। অন্যদিকে আবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, সেখানে মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে শুধু বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় গলাকাটা স্বত্বব্যবস্থা ও অন্যান্য পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। চমস্কি মনে করেন, বিশ্বায়নের এই চেহারাটা খারাপ। এর রয়েছে অনেক ক্ষতিকর প্রভাব। তিনি মনে করেন, 'মুক্তবাণিজ্য চুক্তিগুলোর' বেশির ভাগ উপাদানে আসলে মুক্তবাণিজ্য বলে কিছু নেই, এমনকি অর্থপূর্ণ কোনো বাণিজ্যও এর মধ্যে নেই (C.J. Polychroniou, interview with Noam Chomsky)।

পৃথিবী ধ্বংসে বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও করপোরেশনগুলোর ভূমিকা বুঝতে হলে পরিবেশের সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্ক বুঝতে হবে। পিটার ডওভারন যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল কদম ফেলেছেন, তা ভিন্ন আঙ্গিকে খতিয়ে দেখা উচিত। যেমন একই রকম ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে নাওমি ক্লেইন *দিস চেঞ্জেস এভরিথিং* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে বড় ব্যবসায়ী ও করপোরেশনগুলো আমাদের পৃথিবীকে সত্যিই ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে সেই বইয়ে 'দ্য বিজনেস অব

সিএসআর' এবং 'দ্য ডার্ক সাইড অব বিগ বিজনেস' অধ্যায় দুটি এই আলোচনার চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য খুবই উপযোগী। সেখানে তিনি সমাধানও বাতলেছেন, আর তা নিহিত আছে বিদ্যমান ব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে ফেলার মধ্যেই (Klein, 2014)।

যে প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, পরিবেশের সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্ক খতিয়ে দেখা, সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক পিটার নুয়েলের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডওভারনের বেশ আগেই ২০১২ সালে নুয়েল *গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট: ক্যাপিটালিজম, ইকোলজি অ্যান্ড পাওয়ার* গ্রন্থটি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে বিশ্বায়ন ও পরিবেশের মধ্যকার এই সম্পর্ক পরিচালনা করা হয়। সেখানে এই দুইয়ের সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তিনি রেখেছেন: কে পরিচালনা করে, কার জন্য পরিচালনা করা হয় আর এর ফলে সামাজিক ও প্রতিবেশিক প্রভাবই-বা কী পড়ে। এ ছাড়া তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনীতি যেভাবে চলছে, তা কি টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? বিদ্যমান যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে আমাদের সামনে, সেগুলো কি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সক্ষম? বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা এবং সামষ্টিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব? বিশ্বায়ন যে সন্দেহাতীত সম্পদ সৃষ্টি করে থাকে (কিছু মানুষের জন্য), সেগুলো দিয়ে কি আরও বেশি ন্যায্য ও টেকসই উন্নয়নের (সবার জন্য) দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে? নাকি বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের ধারণাই আসলে বেমানান?' (Newell, 2012, pp. 2-3)। এই প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণের মধ্যেই পরিবেশ ও বিশ্বায়নের বিদ্যমান সম্পর্কের ধরন কী রকম, তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে এ-ও বোঝা যায় যে বড় ব্যবসায়ী ও করপোরেশনগুলো আমাদের পৃথিবী ধ্বংস করবে, নাকি রক্ষা করবে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নুয়েল যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন, তা হলো বিশ্বায়ন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো স্বশাসিত প্রক্রিয়া নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, বিশ্বায়ন হলো 'রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বেসরকারি ক্রীড়নকদের (অ্যাক্টর) সুচিন্তিত সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তাতাড়িত একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাকে তারা প্রায়ই সেবা করে থাকে' (Newell, 2012, p. 4)। নুয়েলের মতে, বিশ্বায়ন 'প্রথমত এবং সর্বাগ্রে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া' (Newell, 2012, p. 4)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়নকে দেখতে গিয়ে নুয়েল এই ব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে বাণিজ্য, উৎপাদন ও অর্থায়নের ওপর নজর দিয়েছেন। তাঁর যুক্তিতে, 'উৎপাদন, বাণিজ্য ও অর্থায়ন প্রবাহের ধরন এবং বেশ কিছু ক্রীড়নকের দ্বারা এই বিষয়গুলোর শাসনপ্রক্রিয়া ও শাসনপ্রক্রিয়ার শিথিলতা...বিশ্বায়ন ও

প্রতিবেশের মধ্যকার সম্পর্কবিন্দু বোঝার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয়' (Newell, 2012, p. 7)।

বিশ্বায়ন, আনুষ্ঠানিক রাজনীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং পরিবেশগত ক্ষতির মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরতে গিয়ে নুয়েল যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা রূপান্তরমূলক প্রাক্সিস বা চর্চার মধ্যে প্রোথিত। অনেকাংশে তা নির্ভর করেছে ক্রিটিক্যাল রাজনৈতিক অর্থনীতি ও হিস্টোরিসিজম বা ইতিহাসবাদের ওপর। নুয়েল জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্বায়ন এমন এক ঘটমান বিষয়, যার উদ্ভবই হয়েছে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও পরিস্থিতি থেকে। ঐতিহাসিক এজেন্ট ও পরিস্থিতির ফলাফল হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণায়নের ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠী বিশ্বায়নকে সংগঠিত করার মাধ্যমে চিরস্থায়ী রূপ দেয়, নুয়েল তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি সংস্কার ও আর্থ-রাজনৈতিক রূপান্তরের কথা বলেছেন।

নুয়েলের *গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট* বইটি শুরুই হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিবেশ বা পলিটিক্যাল ইকোলজির ধারণা খোলাসা করার মাধ্যমে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে যেসব সামাজিক সম্পর্ক পরিবেশ দূষণে প্রভাব রাখছে, সেগুলো তিনি খতিয়ে দেখেছেন। এ বিষয় পিটার ডওভারনের বইয়ে অনুপস্থিত ছিল। তিনি প্রবৃদ্ধিকে বস্তুগত ভিত্তি থেকে আলাদা করার কথা বলেছেন। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে, বিশ্বায়িত পৃথিবীতে পরিবেশ বিষয়ে শাসনপ্রক্রিয়ার বেশ উন্নত একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির মাধ্যমে উত্থাপিত বিষয়গুলো নুয়েল খতিয়ে দেখেছেন।

এই ভিত্তি থেকেই আমরা দেখতে পাই নুয়েলের উত্থাপিত প্রশ্নমালা। যেমন পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কে পরিচালনা করে এবং কী পরিচালনা করা হয় বা কার উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি তিনি বৈশ্বিক এজেন্টগুলোর আচরণ এবং বিশ্বায়নের আকৃতি ও যাত্রাপথকে প্রভাবিত করতে বিভিন্ন সত্তা যেসব প্রচেষ্টা চালায়, সেগুলোর সামাজিক-প্রতিবেশিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য খতিয়ে দেখেছেন। এই তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশগত পরিবর্তন এবং বিশ্বায়িত বাণিজ্য, উৎপাদন ও অর্থায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের গভীর অনুসন্ধান। রাজনৈতিক প্রতিবেশ এবং এসব সম্পর্কের শাসনপ্রক্রিয়া বিষয়ে নুয়েল বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

নুয়েল দেখিয়েছেন, বিশ্বায়নকে যেভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয় এবং ভাবা হয়, এ প্রক্রিয়া অনিবার্য বা মানবসমাজের প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফল, তা ভুল। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ কমে গেছে বা নিরপেক্ষ হয়ে গেছে বলে বিদ্যমান যে ধারণা রয়েছে, তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন নুয়েল। বিপরীতে নুয়েল জোর

দিয়ে বলেছেন, বিশ্বায়নের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো রয়েছে, সেগুলো তৈরি করা ও তদারকি করার প্রধান নিয়ামক রাষ্ট্রই। আবার বিশ্বায়নের অগ্রযাত্রায় রাষ্ট্রই প্রভাবশালী সেই দর্শক, যে কৌশলগত কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে।

নুয়েলের মতে, এই ব্যবস্থায় প্রোথিত ও প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় সাংস্কৃতিক আধিপত্য এগিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্র ও রাজনীতিবিদেরা। এটা তারা করে থাকে এমন এক ভাব করার মাধ্যমে, যেখানে মনে হবে এসব গোষ্ঠীর স্বার্থের বিরোধিতা করা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরের বিষয়। নুয়েল এই যুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বাইরের নিয়ামকেরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা চিরতরে সম্পূর্ণ বিলোপ করে দিয়েছে বলে যে ধারণা চালু আছে, তার বিরোধিতা করেন। এই যুক্তির আলোকে নুয়েল বৈশ্বিক পরিবর্তনের তথাকথিত অদৃশ্য ও স্বশাসিত এজেন্ট হিসেবে বাজার-ব্যবস্থার রহস্যভেদ করেছেন। পাশাপাশি তিনি আলোকপাত করেছেন রাষ্ট্রের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকার পেছনে যে ক্ষমতার সম্পর্ক কাজ করে, তার ওপর।

তবে নুয়েলের আলোচনার বাইরে সম্প্রতি আবার ভিন্ন ধারাও দেখা যাচ্ছে। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো বিশ্বায়নসৃষ্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং পণ্য, সেবা, পুঁজি ও মালিকানার প্রবাহগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। এই রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই মালিক, আবার নিয়ন্ত্রকও। এই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নব্য উদারনীতিবাদী বিশ্বায়নের যুগেই সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর নজির সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রে। চীন, রাশিয়া বা ব্রাজিলের মতো রাষ্ট্রগুলোই হুয়াওয়ে, গাজপ্রম বা পেট্রোবাসের মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর চালকের আসনে।

এই কোম্পানিগুলোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কখনো অনেক বেশি, কখনো আবার অপেক্ষাকৃত কম। এর ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে মার্কিন-চীনা বাণিজ্যযুদ্ধের মতো ঘটনা। তাই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বর্তমান জাতীয়তাবাদী চাপ থেকে অনুমান করা যায়, রাষ্ট্র আবারও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। কিন্তু সেটা তারা করতে পারছে বিশ্বায়নেরই সৃষ্টি করা সম্পর্কগুলোর ওপর ভিত্তি করে। তাই বলা যায়, নুয়েল যে ক্ষমতার সম্পর্কের কথা বলেছিলেন, সেই বৈশ্বিক ক্ষমতার সম্পর্কে একটা রূপান্তর ঘটেছে, যেখানে রাষ্ট্র, করপোরেশন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একে অপরকে ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থার চেহারা তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়ার শাসনব্যবস্থার ধরন কী হবে, তার ওপরই নির্ভর করবে চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য, উৎপাদন ও অর্থায়নের ময়নাতদন্তের এই যাত্রায় নুয়েল শাসনব্যবস্থার ধারণা প্রসারিত করেছেন। এই ধারণার মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের বাইরের ক্রীড়নকদের যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তেমনি যুক্ত করেছেন বিভিন্ন আন্দোলন, যেগুলো প্রায়ই বিশ্বায়নের চর্চাকে সফলভাবে প্রভাবিত করতে

পারে। বইয়ে তিনি তুলে এনেছেন, কীভাবে করপোরেশনগুলো স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সনদ প্রদানের ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়া দেখায়। যেমন ফরেস্ট ও মেরিন ফিশারিজ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যেসব সনদপ্রদান-ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি কপোরেশনগুলোর প্রতিক্রিয়া।

এ ছাড়া নুয়েল উল্লেখ করেছেন মুক্ত বাণিজ্যবিষয়ক আলোচনাগুলো কীভাবে প্রতিবাদকারী আন্দোলনকর্মীরা বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে বিশ্বায়িত উৎপাদন ও বাণিজ্যের প্রক্রিয়া ও প্রভাবকে প্রভাবিত করে। বিশ্বায়িত দুনিয়ায় শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়, সেই প্রশ্নে নুয়েল এমন সব রূপান্তরকামী পদক্ষেপের উল্লেখ করেছেন, যেগুলো একটি সুন্দর পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এর বাইরেও নুয়েল উপসংহার টানতে গিয়ে বলেছেন যে বিশ্বায়নের শাসনব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর হবে তখনই, যখন 'ব্যবসার স্বার্থে শাসনব্যবস্থা' তৈরি না করে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে শাসনব্যবস্থা তৈরি করা হবে। এই যে ব্যবসার স্বার্থে শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়, নুয়েলের মতে, এর কারণ হলো নব্য উদারনীতিবাদী ধ্যানধারণা। আর এই ধ্যানধারণাই বর্তমান বিশ্বের প্রধান যেসব আর্থিক ও সামাজিক ক্রীড়নক আছে, তাদের চিন্তার ওপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছে। পিটার ডওভারন তাঁর বইয়ে বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনগুলো নিজেদের স্বার্থে পৃথিবী রক্ষা করবে বলে যে ফিরিস্তি দিয়েছেন, তা বহুলাংশে এই ধ্যানধারণার বিস্তৃত প্রভাবেরই অংশ। ডওভারন নিজের অজান্তেই সেই ধ্যানধারণার আবর্তে ঢুকে গেছেন, যা গায়ত্রী স্পিভাকের স্যাংকশনড ইগনোরেন্সের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বিশ্বায়িত বাণিজ্য, উৎপাদন ও অর্থায়নের জগতে শাসনব্যবস্থা ও চর্চার রহস্য ভেদ করতে গিয়ে নুয়েল বলেন, পরিবেশের রাজনীতি বলতে শুধু আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে ধরা যাবে না। এই বিষয়ে এটা খুবই সংকীর্ণ সংজ্ঞা। এর ফলে ব্যাপক আকারে পরিবেশ বিনাশের পেছনে আসল কারণগুলো সম্পর্কে খুবই সীমিত ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাবে। বিস্তৃত কারণ অজানাই থেকে যাবে। নুয়েল জোর দিয়ে বলেন, 'পুঁজির পরিক্রমা এবং সেই পরিক্রমার পেছনের রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিবেশকে যুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। আবার নির্দিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিবেশ ও সামাজিক সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন কেন হয়, তা-ও ভুলে গেলে চলবে না' (Newell, 2012, p. 158)।

পরিবেশের বিনাশ ঠেকানো এবং যেখানে সম্ভব সুষ্ঠু-সুন্দর সমাজ ও প্রতিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা থেকে নুয়েল বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণের ওপর জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ও প্রভাবের বিষয়ে ভালোভাবে অবগত উপলব্ধির ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগণকে

একত্র করার আহ্বান জানিয়েছেন। এখান থেকেই ভাবতে হবে পৃথিবী বাঁচানোর ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন কেন প্রয়োজন। আন্দোলনের ভবিষ্যৎই-বা কী, সেটা বোঝাও জরুরি।

আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারময়?

সামাজিক আন্দোলন নিয়ে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী চার্লস টিলি লিখেছেন *সোশ্যাল মুভমেন্ট, ১৭৬৮-২০০৪* বইটি। সামাজিক আন্দোলন বলতে এখন আমরা যা বুঝি, তা বরাবরই একই রকম ছিল না। টিলি তাঁর বইয়ে সামাজিক আন্দোলন নিয়ে এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক আখ্যান হাজির করেছেন। এর মাধ্যমেই ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন সময়ে চলা সামাজিক আন্দোলনের জটিল সব কার্যকারণ সম্পর্ক (Tilly, 2004)। যাহোক, এই প্রবন্ধের মনোযোগের বিষয় হলো পরিবেশ ধ্বংস ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বিপন্নতার যে চিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

২০১০ সালের পর থেকে বিশ্বজুড়ে সাড়া-জাগানো বেশ কিছু গণ-আন্দোলন দেখা গেছে। সামাজিক আন্দোলন নিয়ে নতুন করে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি করে দিয়েছে এসব আন্দোলন। আরব বসন্ত, গ্রিস ও স্পেনে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, চিলি, কানাডা, যুক্তরাজ্য, এমনকি বাংলাদেশেও ছাত্র আন্দোলন এবং উইকিলিকসের উত্থান ও পতন বা বৈশ্বিক অকুপাই মুভমেন্টগুলোর কথা এ প্রসঙ্গে টেনে আনা যায়।

এসব আন্দোলনে লেখক ও গবেষকেরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন আন্দোলন ও ভিন্নমতের নতুন উপাদানগুলো খতিয়ে দেখার। অনেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ম্যানুয়েল ক্যাস্টেলস ও পল ম্যাসনের সাম্প্রতিক কাজ। তারা জোর দিয়েছেন দ্রুত ও তরল ধরনের সাংগঠনিক ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের শক্তির ওপর। এসব আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে খুব দ্রুত আর এগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো তরল বলতে বোঝানো হয়েছে যেগুলোর নির্দিষ্ট কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার কারণে। এসব আন্দোলন ও শক্তিকে সহায়তা করেছে উন্মুক্ত যোগাযোগপ্রযুক্তি (Castells, 2012; Mason, 2013)। এটা ঠিক যে এই লেখকেরা ভবিষ্যতের আন্দোলনের ব্যাপারে দিক বাতলে দেওয়া নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও নব্য উদারনীতিবাদের মূলমন্ত্র 'আর কোনো বিকল্প নেই' কথাটির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের চলমান সংগ্রামের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

তবে সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন নিয়ে পিটার ডওভারন ও জেনেভিভ লোব্যারন তাঁদের বইয়ে খুবই নিরাশার বাণী শুনিয়েছেন। লেখকদ্বয় তাঁদের *প্রটেস্ট*

ইনক: দ্য করপোরেটাইজেশন অব অ্যাক্টিভিজম গ্রন্থে বলছেন যে বর্তমান পৃথিবীতে এমন এক ধারা শুরু হয়েছে, যেখানে শুধু রাষ্ট্রীয় রাজনীতিই নয়, প্রতিবাদ-আন্দোলনেরও করপোরেটাইজেশন হচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এসব আন্দোলনও করপোরেট পুঁজির অধীনস্থ হয়ে পড়েছে। এর প্রমাণও তাঁরা দিয়েছেন। অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, এনজিও ও সামাজিক আন্দোলনের সংগঠনগুলোর যেসব করপোরেশনের বিরোধিতা করার কথা, তাদের সঙ্গেই এসব আন্দোলন সংগঠন ও গ্রুপগুলো অংশীদারত্বে যাচ্ছে। একই সঙ্গে, তৃণমূলে যেসব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলোও ক্রমাগত নতুন নতুন চাপের মুখে পড়ছে, যাকে তাঁরা বলছেন 'ভিন্নমতের নিরাপত্তাকরণ' বা সিকিউরিটাইজেশন অব ডিসেন্ট। ফলে, রাষ্ট্রগুলো প্রতিবাদকারী ও আন্দোলনকর্মীদের দমনের উদ্দেশ্যে পুলিশের মাধ্যমেই সামরিক কায়দাকানুন ব্যবহার করছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে *প্রটেস্ট ইনক* বইয়ে পাওয়া যায় বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর রূপের প্রতিফলন। যেখানে বৈশ্বিক সমস্যার প্রসন্ন সমাধান দেওয়ার মাধ্যমে আন্দোলনকারীদেরও পুঁজিবাদ তার স্রোতের অধীনে ভাসাতে চায়। লেখকেরা যুক্তি দিয়েছেন যে এসব সমাধান কোনোভাবেই করপোরেট স্পনসরের মাধ্যমে সংগঠিত আন্দোলনের অন্ধগলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না, যেমন পারে না বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে।

আন্দোলনের অবস্থান বোঝার চেষ্টারত এই বই দীর্ঘ ঐতিহ্যের অংশ, অন্তত মার্ক্সের *এইটিনথ ব্রুমেইখ অব লুইস বোনপার্টে* (১৮৫২) বইয়ের সময় থেকে এই ধারা শুরু। এর মাধ্যমেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করতে বিভিন্ন শক্তি সক্রিয় রয়েছে (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 1)। মার্ক্সও আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে কেন ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে ও তার পরও সামাজিক শ্রেণিগুলো তাদের 'সঠিক' ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল (Marx, 1852)। অথবা গ্রামসির কথা বলা যায়, যিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন যে কেন ফ্যাসিবাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হওয়ার পরও ফ্যাসিবাদ তার সামাজিক সমর্থন বজায় রাখতে সক্ষম (Gramsci, cited in Adamson, 1980)।

এ ছাড়া বলা যায় সিচুয়েশনিস্টদের কথা। সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে আভাঁগার্দ শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের সমন্বয়ে গড়া সামাজিক বিপ্লবী গোষ্ঠী, যারা ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। ১৯৫৭ সালে এই সংগঠন গঠিত হয়ে ১৯৭২ সালে ভেঙে যায়। এই দলের লোকেরাও ভাবতেন, কীভাবে ভোগবাদী পুঁজিবাদ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকৃত কল্পরাজ্যের সম্ভাবনা ভোঁতা করে দিয়েছে। যাহোক, এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের পথ ধরে ডওভারন ও লোব্যারনের আগ্রহ হলো, কীভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা

ব্যাপৃত ও শক্তিশালী আন্দোলনগুলো যেসব কাঠামো ও ডিসকোর্সের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর নিচেই এসব আন্দোলন চাপা পড়ে গেছে। সমালোচনা ও ভিন্নমত অঙ্গীভূত করে ফেলার পুঁজিবাদী সক্ষমতা সম্পর্কে লেখকেরা বলেন যে এটা ষাট ও সত্তরের দশকের আন্দোলনকারীরা বিলাপ করে পুঁজিবাদের নতুন করে জেগে ওঠার যে চেহারার কথা বলেছেন, তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং এই অঙ্গীভূত করে ফেলার ক্ষমতা আরও বেশি ভয়ানক। কারণ, এখন পুঁজিবাদের অংশ হতে যে চাপ ও জাল ছড়ানো আছে, তা আরও বেশি শক্তিশালী (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 4)।

এই বইয়ে বেশ কিছু নতুন ও পুরোনো বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। অনেক রাজনৈতিক বিজ্ঞানীর কাছেই ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক পুঁজির ক্ষয় এবং আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা পরিচিত বিষয়। তবে একই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ বাদ পড়েছে, যা অস্বাভাবিক। যেমন জরডান ও মেলনির *দ্য প্রটেস্ট বিজনেস?* প্রায় একই নামের বই। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা অনুপস্থিত। এটা ঠিক যে এই আলোচনাগুলো *প্রটেস্ট ইনক* বইয়ে আরও হালনাগাদ করে আনা হয়েছে। যেমন এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলো সাধারণত করপোরেশনগুলোর কাছ থেকে সরাসরি অর্থ নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। তবে লেখকেরা দেখিয়েছেন, কীভাবে গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডসের মতো মধ্যবর্তী উদ্যোগ ও ফাউন্ডেশনগুলো বেশ গোপনে এসব করপোরেশনের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে।

এনজিও বোর্ডগুলোয় করপোরেট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাহীদের বসানো হচ্ছে। সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হলো, নেসলে ও স্টারবাকসের মতো করপোরেট প্রতিষ্ঠানে ফেয়ার ট্রেড সংগঠনের লোগো ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে মনে হতে পারে করপোরেট দুনিয়ায় হয়তো নৈতিক বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়নের ধারণাগুলোর প্রতিফলন হচ্ছে। কিন্তু লেখকেরা দেখিয়েছেন যে এসব প্রতিষ্ঠানে এ রকম নৈতিক ঘুড্ডি লাগানোয় এখন ফেয়ার ট্রেড একটি সংগঠন হিসেবে আর জনসমক্ষে এগুলোর ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে পারবে না। সেই সক্ষমতা গুরুতরভাবে আপস করা হয়েছে।

লেখকেরা দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে তিনটি প্রক্রিয়া মিলেমিশে আন্দোলনকে করপোরেট দুনিয়ার অংশ করে ফেলেছে। এই তিনটি প্রক্রিয়া হলো ১. ভিন্নমতের নিরাপত্তাকরণ বা সিকিউরিটাইজেশন অব ডিসেন্ট। ঐতিহাসিকভাবেই শ্রমিক আন্দোলনগুলো এই নগ্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২. সামাজিক জীবনের বেসরকারীকরণ, যার মানে হলো নব্য উদারনীতিবাদের ঔপনিবেশিকীকরণ, যা থেকে দৈনন্দিন জীবনের কোনো দিকই আর মুক্ত থাকতে

পারে না। ৩. আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, যার মানে হলো করপোরেট দুনিয়া ও বিদ্যমান কাঠামোর সঙ্গে সহযোজন করতে উৎসাহী, এমন পেশাগত আন্দোলনকর্মী গড়ে তোলা (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 2)।

লেখকদের মতে, এই তিন ধরনের প্রক্রিয়ার সম্মিলিত প্রভাব হলো আন্দোলনের সম্ভাবনা গুরুতরভাবে নষ্ট করে দেওয়া। তাঁদের মতে, 'আমরা যা বুঝতে চাইছি, তা হলো, কেন দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলনগুলো ক্রমাগত বৈশ্বিক পুঁজিবাদের কাঠামো গ্রহণ করছে এবং তার আওতায় কাজ করে চলেছে। কীভাবে করপোরেট পুঁজির ক্ষমতার মাধ্যমে সরকারের নীতি ও ব্যবসার ধরন বদলের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা তৃণমূলের প্রতিবাদ ও আন্দোলনগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে' (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 27)। এর ফলাফলই হলো আন্দোলন যতটা র‍্যাডিক্যাল হওয়ার কথা ছিল ততটা হতে পারছে না। আর উল্টোভাবে দেখলে গণমাধ্যমে আন্দোলনকে ক্রমাগত খারাপ হিসেবে দেখিয়ে উপস্থাপন করার ফলে এসব আন্দোলন যতটা না র‍্যাডিক্যাল, তার চেয়ে বেশি র‍্যাডিক্যাল হিসেবে দেখানো হচ্ছে (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 4)।

এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলোর ব্যাপারে লেখকদের সমালোচনা বেশ জোরালো। তবে যে কাঠামোতে সমালোচনা করা হয়েছে, সেটা মাঝেমধ্যে সমস্যাযুক্ত মনে হয়েছে। পুরো বইজুড়ে বলার চেষ্টা ছিল যে করপোরেশন ও বৈশ্বিক সিভিল সমাজের মধ্যকার গভীরতর সম্পর্কের মানে হলো করপোরেশনগুলো সিভিল সমাজকে তাদের অংশ করে ফেলেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক আন্দোলনকারী আছেন, যাঁরা কিছু করপোরেশন যেভাবে তাদের নৈতিক মানদণ্ড প্রকাশ করে, সে বিষয়ে বিচলিত। যেমন এ ধরনের দাবি কেউ কেউ করে থাকেন যে গরিবদের জন্য বিনিয়োগ করা কোনো সামাজিক বিষয় নয়, এটা স্মার্ট অর্থনীতির বিষয়।

তবে এটা বলা যায় যে সব এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনই করপোরেশনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের নিজস্ব আদর্শের সঙ্গে আপস করছে। আরও আশঙ্কাজনক হলো, অনেকেই পুঁজিবাদকে সমস্যার বদলে সমাধান হিসেবে দেখে থাকেন। যেমন অনেকের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে না, যখন কেএফসি স্তন ক্যানসারের বিষয়ে সচেতনতা অভিযান চালায় (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 45)। ফেয়ার ট্রেড ও ইকো-লেবেলিং নীতিকে অনেকে আবার ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন। তাই এটা শুধু সহযোজনের বিষয় নয়, বরং বৈশ্বিক সিভিল সমাজ কী বা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে উদারনীতিবাদী ও বামপন্থীদের কণ্ঠস্বরের মধ্যকার দীর্ঘদিনের যে পার্থক্য, তা-ই প্রতিফলিত হয় এসব বিষয়ের মাধ্যমে।

ফলে এ বই জন্ম দিয়েছে এক গুরুতর প্রশ্নের। আর তা হলো এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলোর কি করপোরেশনগুলোর সঙ্গে কাজ করা উচিত, যেন তারা এসব করপোরেশনের মূল্যবোধ ও চর্চা বদলাতে পারে, নাকি তাদের ক্রিটিক্যাল স্বাধীনতা ধরে রাখা উচিত? আলোচিত বইয়ের লেখকেরা দ্বিতীয় বিকল্পের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা একটি র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন, যা আদর্শগতভাবেও কাম্য। এটা ঠিক যে লেখকেরা চাইলে বলতে পারতেন, বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সমালোচনাকে র‍্যাডিক্যাল বলার মানে হলো আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি এখন, এটা তারই নিদর্শন। গ্লোবাল ওকুপাই মুভমেন্টের কেন্দ্রে ছিল এ ধরনের সমালোচনা। কিন্তু ডওভারন ও লোব্যারন এ বিষয়ে অনেক লেখকের আশাবাদের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনগুলো ক্রমাগত পদদলিত করা হচ্ছে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে। সামরিক কায়দায় পুলিশি তৎপরতায় সেসব আন্দোলন দমন করা হচ্ছে। ভিন্নমতের নিরাপত্তাকরণ বা সিকিউরিটাইজেশন অব ডিসেন্ট ধারণার মূল খুঁজতে গিয়ে লেখকেরা ফিরে গেছেন ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদার ৯-১১ হামলার ঘটনায়। তাঁরা বলেছেন যে এরপর থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিবাদ দমনে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের দোহাই দিয়েছে, যার পদ্ধতি ছিল সামরিক কায়দার 'কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল' নীতি। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরা এখন পরিবেশবাদীদের বলছেন ইকো-টেররিস্ট এবং সামাজিক সাবোটিয়ার বা গোপন ঘাতক। এসব শব্দ ও ভাবমূর্তি তৈরি করার মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহার ঘটে চলেছে। ক্যাটো ইনস্টিটিউটের ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের পরিচালক টিমোথি লিনচের বরাত দিয়ে লেখকেরা জানাচ্ছেন যে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো সাধারণত সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক পুলিশের আচরণের মধ্যে যে বিভাজনরেখা ছিল, তা মিলিয়ে গেছে। তাঁর মতে, ক্রিমিনাল জাস্টিস বিষয়ে এটা খুবই বিব্রতকর এক প্রবণতা, যাকে তিনি বলছেন পুলিশি কায়দার সামরিকীকরণ (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 17)।

লেখকেরা বলছেন যে এর ফলে আমরা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেনশিয়াল প্রশাসনের প্রধান প্রতিবাদ দমনের ক্ষেত্রে 'উন্নত বিশ্বের' ব্যবহৃত পদ্ধতির উদাহরণ টানছে। আর সেসব পদ্ধতি হলো ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর পানির কামান ব্যবহার, গণজমায়েত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে দেওয়া (ক্রাউড কেটলিং), কোনো গোষ্ঠীর ওপর নজরদারি এবং সতর্কতামূলক গ্রেপ্তার (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 69)। যদিও বিষয়গুলো হতাশাজনক, কিন্তু এই বিষয়গুলোই বইটির সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ বলা যায়।

এই বইয়ে ওকুপাই মুভমেন্ট তুলনামূলক কম বিশ্লেষিত হয়েছে। এটা একটু আশ্চর্যজনক, কারণ, অনেক আন্দোলনকর্মীর কাছে ওকুপাই মুভমেন্ট ছিল সত্যিকারের সাংগঠনিক আন্দোলন, যা এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলোর করপোরেটাইজেশনের বিকল্প। বইয়ে এটা স্বীকার করা হয়েছে যে ২০১২ সাল থেকে আন্দোলনগুলোর অগ্রাধিকার সরে যাচ্ছে। কারণ, এসব আন্দোলনের নেটওয়ার্ক কাঠামো এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা টেকসই কোনো প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে খুবই ভঙ্গুর। এখান থেকে এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হলে ভালো হতো কি না। শুধু এ জন্য নয় যে করপোরেট প্রভাব বলয়ের এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলো তা না হলে বৈশ্বিক সিভিল সমাজের হয়ে কথা বলার যে দাবি তোলে, তার কোনো প্রতিক্রিয়া কেউ দেখাতে পারে না।

লেখকদের মতে, 'এটা পরিষ্কার যে বৈশ্বিক ব্যবস্থা রূপান্তরে তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন ও গণপ্রতিবাদের তুলনায় বৈশ্বিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে করপোরেট পুঁজির অধীনস্থ আন্দোলন অনেক বেশি তৎপর' (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 137)। এই ধারা আবার কাঠামোগত ধারার সঙ্গে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত, যাকে লেখকেরা বলছেন 'সামাজিক জীবনের বেসরকারীকরণ'। তাঁদের মতে, 'র‍্যাডিক্যাল সামষ্টিক আন্দোলন গগনসম সমস্যার মুখোমুখি। সম্পদ ও সম্পদের স্বপ্নে বিভোর দুনিয়ায় সামষ্টিক বন্ধনগুলো অনেক বেশি ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে, যেখানে সামাজিক জীবনের বেসরকারীকরণ ঘটছে এবং সংস্কৃতিতে রূপান্তর ঘটার প্রক্রিয়া হলো সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিজয়' (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 82)। লেখকদের মতে, সমাজের এই ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণ রসদ পেয়েছে পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে শুরু হওয়া সামষ্টিকতার অবনতির পর্বে (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 87)।

লেখকেরা সমাধান হিসেবে বলেছেন আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এসব পরিস্থিতি মাথায় রেখে কৌশল ঠিক করে এগিয়ে যাওয়া এবং তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনগুলোর কণ্ঠরোধী সরকারি নীতির পুনর্মূল্যায়ন করা (Dauvergne & LeBaron, 2014, p. 156)।

এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলোর কিছু কিছু অর্জন যে আছে, সে কথা ডওভারন ও লোব্যারন নাকচ করে দেননি। কিন্তু বইয়ের উপসংহার তাঁরা টেনেছেন এমনভাবে যে বর্তমানে আমরা আন্দোলনের নামে একধরনের মোহের মধ্যে আছি। এসব আন্দোলনে নাগরিকদের কিছু একটা করার যে তীব্র বাসনা, সেটা কিছুটা মেটায়, কিন্তু বেশির ভাগ বৈশ্বিক সমস্যার মূল উৎপাটনে এগুলো ব্যর্থ। সে জন্য এ বইকে সম্ভবত বলা যায় পলেমিক। অর্থাৎ, এই বইকে বলা যায়

বর্তমানে চলা প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ওপর ক্ষুব্ধ, হতাশ ও নিরাশাবাদগ্রস্ত আক্রমণ, বিশেষ করে বৈশ্বিক সিভিল সমাজের করপোরেট প্রভাবযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। তবে যে-কেউ এটাও বলতে পারে যে হয়তো লেখকেরা চেয়েছেন পাঠকদের মধ্যে আরও বেশি ক্রিটিক্যাল রিজনিং, গবেষণা ও প্রতিবাদ কর্মের সূচনা হোক। লেখকদের এই উদ্দেশ্যও অবজ্ঞা করার মতো নয়।

সমাধান কী?

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে দুর্যোগ-দুর্ভোগ ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত জীবন্ত সত্তার জন্যই পৃথিবী খুব শিগগিরই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়ে যাবে এই শতকের শেষে। এতে মানবসভ্যতাই বিলুপ্তির মুখে পড়বে। এখনো বড় ধরনের দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব, যা কিছুদিন পর আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে না। এ জন্য দরকার বৈশ্বিক উৎপাদনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটানো, যেমন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার মেটাবলিজম বা বিপাকে আমূল পরিবর্তন আনা।

এই দুর্যোগ এড়াতে হলে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের হার প্রতিবছর ৫ শতাংশের মতো কমাতে হবে, যার মানে হলো ধনী দেশগুলোকে তাদের কার্বন নির্গমন প্রায় দুই অঙ্ক কমাতে হবে। এ ছাড়া প্রায় ১৫০ গিগা টন কার্বন বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারণ করতে হবে, যদি আমরা বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখতে চাই (Hansen et al., 2013)। প্রথম কথা হলো এসব সমাধানও আর কিছুদিন পর কাজে আসবে না, যদি সবাই মিলে এখনই পদক্ষেপ না নেয়। হাতের কাছে যেসব সমাধান আছে, তা কাজে লাগাতে হবে। যেমন: বিকল্প জ্বালানি, সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ। কিন্তু এর বাইরেও দরকার বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। যুক্তরাজ্যের টিনড্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কেভিন এন্ডারসন যেমন বলেছেন যে আমাদের 'রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের' বিরোধিতা করতে হবে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির অর্থনীতি ও নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তির বিরোধিতা করতে হবে। বিদ্যমান এই ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভই বহুজাতিক কোম্পানি, যাদের মধ্যে মাত্র ১০০ কোম্পানি মিলেই ৭০ শতাংশের বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে চলেছে।

এ জন্য দরকার বিভিন্ন ক্ষেত্র একত্র করে একটি কো-রেভল্যুশনারি আন্দোলন। কো-রেভল্যুশনারি তত্ত্বের ধারণা এসেছে ডেভিড হার্ভের কাছ থেকে। রাজনৈতিক আন্দোলন এক পরিমণ্ডল থেকে অন্য পরিমণ্ডলে চলমান রাখতে হবে, আবার একটা আরেকটাকে শক্তি জোগাবে—সেই ব্যবস্থাও করতে হবে (Harvey,

2010, p. 228)। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে সামাজিক পুনরুৎপাদন ও টেকসই মানব উন্নয়ন। কিন্তু এটা হতে হবে বিরাট আন্দোলন। এখানে পৃথিবীর সব ক্ষেত্রের মানুষকেই যুক্ত করতে হবে। সব কটি বৈশ্বিক সমস্যাই একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত। তবে জলবায়ু আন্দোলন আশু প্রতিক্রিয়া দাবি করে। এ রকম আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে, যার কথা শুরুতে বলা হয়েছে। এগুলোকে নাওমি ক্লেইনের ভাষায় বলা হচ্ছে ব্লক্যাডিয়া। বেলামি ফস্টারের মতে, এই ব্লক্যাডিয়ার সাফল্য নির্ভর করছে পরিবেশ প্রলেতারিয়েত আবির্ভাবের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনের কবলে পড়া দরিদ্র দেশগুলোয় ইতিমধ্যে বিশ্লেষকেরা এই শ্রেণির উদ্ভব চিহ্নিত করা শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে এটা স্বীকৃত যে আমাদের বস্তুগত সংগ্রাম ও পরিবেশ বিষয়ে সংগ্রাম আসলে একই সূত্রে গাঁথা। কারণ, আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি, নিশ্বাস নিই এবং কাজ করি, সেগুলো সবই এক।

মান্থলি রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক জন বেলামি ফস্টার আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'আমাদের সামনে যে সংকট, তা সামাজিক ও প্রতিবেশিক—দুটোই। এর সমাধানে দরকার সমন্বিত মানবতার নিয়ন্ত্রণের অধীনে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার মেটাবলিজম বা বিপাকের যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ। মানে হলো মানবপ্রজন্মের পরিপূর্ণ প্রক্রিয়ার চাহিদা অনুসারে সুন্দর, স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইকোসিস্টেমের ও বিভিন্ন প্রজাতির আবাসস্থলের প্রবাহ, চক্র, ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলো পুনরুৎপাদন করা এবং সেগুলো রক্ষা করা। ইতিহাসজুড়ে মানুষের কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানবমুক্তি এবং পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো। এই কাজে প্রথম জরুরি বিষয় হলো সমতা ও কমিউনিটির ধারণা। আর দ্বিতীয়টি হলো মানব উন্নয়ন ও টেকসইত্ব অর্জন। এই সামষ্টিক অগ্রগতির জন্য চলমান সংগ্রামগুলোর ওপরই আমাদের শেষমেশ নির্ভর করতে হবে। মানুষের যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে এই সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ নেই' (Foster, 2019)।

পরিবেশ ও জলবায়ুসংকটের সমাধানে ব্যক্তিপর্যায়েও দায় রয়েছে। জীবনপ্রণালি বদলে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখা যায়। কিন্তু সামগ্রিক ব্যবস্থা পাল্টানোই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। *ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম* জার্নালে এক সাক্ষাৎকারে বেলামি ফস্টার এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন চমৎকারভাবে। যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, যদি শহরের সব বাসাবাড়ির বর্জ্য কমানো হয়, তাহলে মোট বর্জ্যের মাত্র ৩ শতাংশ কমবে। বাকি সবটাই ব্যবসায়ী করপোরেশনগুলোর বর্জ্য। সে ক্ষেত্রে তাদের বাধ্য করতে হলে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনের মাধ্যমেই চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

একথা সত্য যে আন্দোলনের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ এখন আর কাজ করে না। নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ম্যাজিক হলো অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে সমাজকে এমনভাবে বদলে ফেলা, যেখানে ব্যক্তি আর সমষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ করে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন সমাজে প্রথাগত আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নেই। মূল্যবোধের এই পরিবর্তন এখানে বড় ভূমিকা রাখছে। এটা মূল্যবোধের অবক্ষয়, না পরিবর্তন—তা নিয়েও বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড রুবিন এক সাড়া-জাগানো বইও লিখেছেন। রুবিন তাঁর *সোল, সেল্ফ, অ্যান্ড সোসাইটি : দ্য নিউ মোরালিটি অ্যান্ড দ্য মডার্ন স্টেট* (২০১৫) গ্রন্থে এগুলোকে বলছেন পরিবর্তন, অবক্ষয় নয়। এর অর্থ হলো পরিবেশ আন্দোলনে এই পরিবর্তিত মূল্যবোধ মাথায় রেখেই কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। অস্ট্রেলীয় দার্শনিক কার্ল পপার যেমন বলেছেন আশাবাদী হতে। তিনি বলেছিলেন, আশাবাদ একটি নৈতিক দায়িত্ব। বলতে চেয়েছিলেন যে ভবিষ্যৎ কখনো লেখা থাকে না। বরং ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমরা বর্তমানে কী করব, তার ওপর।

জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে কোনো আন্দোলনই মানুষকে আকর্ষণ করে না। তাই পরিবেশ ও জলবায়ু-ন্যায্যতার আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের উচিত এই আন্দোলন যে মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার ওপর জোর দেওয়া। পরিবেশ ও জলবায়ুর মতো বায়বীয় বিষয়ে মানুষের আগ্রহ থাকবে না, যতক্ষণ না তারা বুঝবে, এই বায়বীয় বিষয়ই তাদের বস্তুগত বিষয়ের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

গ্রন্থপঞ্জি

Ambrose, Jillian. 2019. Most of world's biggest firms 'unlikely' to meet Paris climate targets. *The Guardian* 24 September, 2019. Can be Accessed at : https ://www.theguardian.com/environment/2019/sep/24/most-of-worlds-biggest-firms-unlikely-to-meet-paris-climate-targets

Barkham, P. 2016. Greenland : the country set to cash in on climate change. *The Guardian*, 23 December 2016. Can be accessed at : https ://www.theguardian.com/environment/2016/dec/23/climate-change-in-greenland-adaptation-we-simply-refuse-to-be-victimised

Baviskar, A. 2003. For a Cultural Politics of Natural Resources. *Economic and Political Weekly* 38 (48) : 5051-5055.

Bracking, S. 2015. Performativity in the Green Economy : How Far Does Climate Finance Create a Fictive Economy? *Third World Quarterly* 36 (12) : 2337-2357.

Brown, B., and S. J. Spiegel. 2017. Resisting Coal : Hydrocarbon Politics and Assemblages of Protest in the UK and Indonesia. *Geoforum* 85 : 101-111.

Bumpus, A. and D. Liverman. 2008. Accumulation by Decarbonization and the Governance of Carbon Offsets. *Economic Geography* 84 : 127-155.

B scher, B., and Fletcher, R. 2015. Accumulation by Conservation. *New Political Economy* 20 (2) : 273-298.

Castells, M. 2015. *Networks of Outrage and Hope : Social Movements in the Internet Age*. John Wiley & Sons.

Clark, B., Foster J. B., and R. York. 2010. *The Ecological Rift : Capitalism's War on the Earth*. New York : Monthly Review Press.

Cook, J., Nuccitelli, D., Green, S. A et. al. 2013. Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. *Environmental Research Letters* 8 (2013) 024024 (7pp).

Corbera, E., and K. Brown. 2010. Offsetting Benefits? Analyzing Access to Forest Carbon. *Environment and Planning* 42 : 1739-1761.

Dauvergne, P. 2018. *Will Big Business Destroy Our Planet?*. Cambridge, UK : Polity Press.

Dauvergne, P., and J. Lister. 2013. *Eco-Business : A Big-Brand Takeover of Sustainability*. MIT Press.

Descartes, R. 1641. *Meditations on First Philosophy*. In Cottingham, et al. (eds.), 1984. *The Philosophical Writings of Descartes*. Vol. II. Cambridge : Cambridge University Press.

Erickson, B. 2018. Anthropocene Futures : Linking Colonialism and Environmentalism in an Age of Crisis. *Environment and Planning D : Society and Space*. Online first. https ://doi.org/10.1177/0263775818806514.

Fairhead, J., Leach, M., Scoones, I. 2012. Green Grabbing : A New Appropriation of Nature? *Journal of Peasant Studies* 39 (2) : 237-261.

Foster, J.B. 1994. *The Vulnerable Planet : A Short Economic History of the Environment*. New York : Monthly Review Press.

Foster, J.B. 1999. *Marx's Ecology : Materialism and Nature*. New York : Monthly Review Press.

Foster, J.B. 2002. *Ecology Against Capitalism*. New York : Monthly Review Press.

Foster, J. B. 2019. Capitalism has Failed-What Next?. *Monthly Review*, 01 February, 2019. Can be accessed at :

https ://monthlyreview.org/2019/02/01/capitalism-has-failed-what-next/#en23backlink

Gramsci, A. *Prison Notebooks*. In Adamson, W. L. 1980. Gramsci's Interpretation of Fascism. *Journal of the History of Ideas* Vol. 41, No. 4 (Oct. - Dec., 1980), pp. 615-633.

Griffin, P. 2017. The Carbon Majors Database. CDP Carbon Majors Report 2017. Can be accessed at : http ://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Carbon-Majors-Report-2017.pdf

Hansen, J. et. al. 2013. Assessing 'Dangerous Climate Change' : Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature. *PlosOne*, December, 2013. Can be accessed at : https ://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0081648

Harvey, D. 2010. *The Enigma of Capital : and the Crises of Capitalism*. Oxford University Press.

Jevons, W. S. 1865. *The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines*. London : McMillan & Co.

Jordan, G., and W. A. Maloney. *The Protest Business? : Mobilizing Campaign Groups*. Manchester and New York : Manchester University Press.

Kaijser, A., and A. Kronsell. 2014. Climate Change through the Lens of Intersectionality. *Environmental Politics* 23 (3) : 417-433.

Klein, N. 2014. *This Changes Everything : Capitalism vs. The Climate*. London, UK : Simon and Schuster.

Lohmann, L. 2008. Carbon Trading, Climate Justice and the Production of Ignorance : Ten Examples. *Development* 51 (3) : 359-365.

LeBaron, G, and P. Dauvergne. 2014. *Protest Inc. : The Corporatization of Activism*. Cambridge, UK : Polity Press.

Li, T. 2014. *Land's End : Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.

Mason, Paul. 2013. *Why It's Kicking Off Everywhere*. UK : Verso Books.

Marx, K. 1981. *Capital, Vol III*. New York : Vintage.

Marx, K. 1852. *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. First Published in the first issue of *Die Revolution*. Can be accessed at : https ://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/18th-Brumaire.pdf

Martinez-Alier, J., L. Temper, D. Del Bene, and A. Scheidel. 2016. Is

There a Global Environmental Justice Movement? *Journal of Peasant Studies* 43 (3) : 731-755.

Newell, P. 2012. *Globalization and the Environment : Capitalism, Ecology and Power*. Cambridge, UK : Polity Press.

Polychroniou, C.J. Interview with Noam Chomsky. 2019. 'Noam Chomsky : "Worship of Markets" is Threatening Human Civilization', *Thruthout*, 17 July 2019. Can be accessed at : https ://truthout.org/articles/noam-chomsky-worship-of-markets-is-threatening-human-civilization/

Rubin, E. L. 2015. *Soul, Self, and Society : The New Morality and the Modern State*. Oxford University Press.

Saito, K. 2017. *Karl Marx's Ecosocialism : Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economy*. New York : Monthly Review Press.

Spivak, G. 1999. *A Critique of Postcolonial Reason : Towards a History of the Vanishing Present*. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Terry, G. 2009. No Climate Justice without Gender Justice : An Overview of the Issues. *Gender and Development* 17 (1) : 5-18.

Tilly, C. 2004. *Social Movements, 1768-2004*. Boulder, London : Paradigm Publishers.

York, R. Do Alternative Energy Sources Displace Fossil Fuels?. *Nature Climate Change*. 2(6) : 441-443, June 2012, DOI : 10.1038/nclimate1451

ইসলাম, এম মোফাখ্খারুল। ২০১৪। পলাশীর যুদ্ধ ও সম্পদ পাচারের সূত্রপাত। *প্রতিচিন্তা* অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪।

ইসলাম, সিরাজুল। ২০১৪। ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা (১৭৮৫-১৮৩০)। *প্রতিচিন্তা* জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪।

বই আলোচনা

জাতীয়তাবাদ শেষ কথা হতে পারে না

প্রতীক বর্ধন

ক্রসিং দ্য বে অব বেঙ্গল : দ্য ফিউরিস অব নেচার অ্যান্ড দ্য ফরচুনস অব মাইগ্র্যান্টস—সুনীল এস অমৃত, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩।

জাতীয়তাবাদ—প্রপঞ্চ হিসেবে বিশ শতকের সবচেয়ে পূজিত এই শব্দ যে কী করতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিকই টের পেয়েছিলেন[১]। আর পেয়েছিলেন বলেই জাতিগত স্বার্থের ওপরে তিনি মানবতাকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। আবার এ-ও ঠিক যে ঔপনিবেশিক শাসনের করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জনগণের সামনে যে ইউটোপিয়া হাজির করতে হতো, জাতীয়তাবাদ তাদের ঠিক সেই ইউটোপিয়ারই সন্ধান দিয়েছে। আজ বিশ্বায়ন নিয়ে এত কথা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে যতটুকু যোগাযোগ, তা এই বিশ্বায়নের কল্যাণে। অথচ জাতিরাষ্ট্রের জন্মের আগে পুরো পৃথিবীই একরকম বিশ্বায়িত ছিল। এর জন্য তখন হরেক রকম বহুজাতিক সংস্থার দরকার পড়ত না, মানুষ বিনা পাসপোর্ট-ভিসাতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জমাতে পারত। সুনীল এস অমৃতের এই বক্ষমান গ্রন্থ আমাদের তেমনই এক অনালোচিত বিশ্বায়িত ব্যবস্থার সন্ধান দেয়।

ক্রসিং দ্য বে অব বেঙ্গল : দ্য ফিউরিস অব নেচার অ্যান্ড দ্য ফরচুনস অব মাইগ্রেন্টস গ্রন্থটি আমাদের জানাচ্ছে, আজ যে আটলান্টিক মহাসাগর পণ্যবাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রধানতম পথ হয়ে উঠেছে, তার বহু আগে সেই ১৯ শতকে আমাদের বঙ্গোপসাগর ছিল আরেকটি বিশ্বায়িত ব্যবস্থার পথ। বইয়ের শুরুতেই সুনীল এস অমৃত বলছেন, সোনার বাংলার খ্যাতি একসময় দূর প্রাচ্য দেশ থেকে শুরু করে একদম মিসর ও কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল; আর সেই খ্যাতির টানে আহমেদ রিজালউদ্দিন নামের এক ব্যক্তি আজকের মালয়েশিয়ার

পেনাং থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে ১৮১০ সালে কলকাতা বন্দরে পৌঁছান। বাংলার খ্যাতি এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে কলকাতা বন্দরে ২৪ ঘণ্টাই জাহাজ ভিড়ত তখন। এই অবাধ চলাচলের মধ্য দিয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। কলকাতা বন্দরের পার্শ্ববর্তী গণিকালয়ে যেমন মোগল, পাঠান, বাঙালি দেহপসারিণীদের পাওয়া যেত, তেমনি তাঁদের খদ্দেরেরাও ছিলেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর—ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ডাচ্, চীনা, মালয়ি, তামিল প্রভৃতি।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ভারতে আসত, আবার ভারতের মানুষও সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজকের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও মিয়ানমারে যেত। অর্থাৎ সুনীল এস অমৃত এখানে এশীয় যোগাযোগের এক অনালোচিত অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন, যে ব্যবস্থায় বঙ্গোপসাগর দিয়ে শুধু শ্রীলঙ্কার সঙ্গেই ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল—তা নয়; যোগাযোগ বিস্তৃত ছিল থাইল্যান্ড, পশ্চিম মালয়, উত্তর সুমাত্রা হয়ে আরও পশ্চিমের সমৃদ্ধ বাজার পর্যন্ত। বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত পণ্য ও মানুষ এত অনায়াসে চলাচল করত যে পুরো ব্যাপার একসময় ভারত মহাসাগরের বিশাল বাণিজ্যব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছিল। এই যোগাযোগব্যবস্থার ট্রানজিট ছিল আজকের মালাক্কা প্রণালি, যেখানে তিনটি আন্তসম্পর্কিত ব্যবস্থার মিলন ঘটেছিল—একটি চলে গেছে উপমহাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণের কমোরিন অন্তরীপের পাশ দিয়ে, আরেকটি চলে গেছে দক্ষিণ চীন সাগরের পূর্ব পাশ দিয়ে এবং তৃতীয়টি উত্তরে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। বিপুলসংখ্যক ভারতীয় ১৯ শতকের মিয়ানমার ও মালয়েশিয়ায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছেন, তাঁদের পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন হতো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত এক দেশের মানুষ হিসেবে অনায়াসে আরেক দেশে যেতেন তাঁরা।

কত মানুষ এপার থেকে ওপারে এবং ওপার থেকে এপারে এসেছেন, তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান স্বাভাবিকভাবেই নেই। তবে অমৃত বলেন, ১৮৪০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়েছে। তাঁর আক্ষেপের জায়গাটা হলো, এই বঙ্গোপসাগর একসময় বিশ্বের সবচেয়ে চালু অভিবাসনের পথ হলেও এটি সে রকম পরিচিতি তো পায়ইনি, বরং সবচেয়ে কম জানা অঞ্চলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। ভারত মহাসাগর দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরের যোগাযোগ নিয়ে ১৯৬০-এর দশকে ইতিহাসবিদেরা কিছু লেখালেখি করলেও এই অংশ অনালোচিতই রয়ে গেছে। ইতিহাসবিদেরা বলেন, ইসলাম এই অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। অন্যদিকে, উপমহাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার যোগসূত্র স্থাপন করেছিল বৌদ্ধধর্ম।

সেই প্রেক্ষাপটে আজকের দক্ষিণ এশিয়ার কথা ভাবলে হৃদয়ে দুঃখবোধ ছাড়া ভিন্ন কিছুর সৃষ্টি হয় না। গবেষকেরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক যোগাযোগ

বা সমন্বয় পৃথিবীতে সবচেয়ে কম। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্যে যে খরচ পড়ে, ভারত-ব্রাজিল বাণিজ্যের চেয়ে তা ২০ শতাংশ বেশি[২]। আর পারস্পরিক অবিশ্বাস-অসদ্ভাবের কথা নাহয় না-ই বললাম। বৈরিতার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্র ভারত থেকে আলাদা হয়েছে, ফলে দুদেশের সম্পর্ক থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করাও হয়তো সমীচীন নয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন উচ্চবর্ণের হিন্দু-প্রভাবিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। অন্যদিকে, নেহরুর উদারনৈতিক ভারত আজ হিন্দুত্বের রথে সওয়ার হয়েছে। সেই রথ কোথায় গিয়ে থামবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ কর্ম নয়।

ব্যাপারটা হলো, জাতিগত স্বার্থের নামে আজকের আধুনিক জাতিরাষ্ট্র যেকোনো কিছু করাই জায়েজ করেছে। সমস্যার গোড়াটা সম্ভবত এখানেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক সে কারণেই একক নেশন বা জাতির ওপর আস্থা রাখেননি। প্রথম দিকে তাঁর ধারণা ছিল, 'নেশন একটি মানস পদার্থ।' কিন্তু পরবর্তীকালে নেশনকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে দেখেছেন তিনি, জনগণকে যা 'যান্ত্রিক প্রয়োজনে' সংঘবদ্ধ করে। তিনি অবশ্য মনে করতেন যে ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজম খাটবে না। কারণ, ইউরোপে শাসক-শোষিতের যে ভেদ ছিল, সেটা জাতিগত বিভেদ নয়, শ্রেণিগত ভেদ। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদ ঘটে ধর্ম ও জাতির নামে। দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জাতি গঠনের চেষ্টা এসব ভেদবুদ্ধি আরও বাড়িয়ে দেবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। সমাজে নানা রকম বিভক্তি থাকায় নেশন নির্মাণ সম্ভব নয়—এটাই ছিল তাঁর অনাস্থার মূল কারণ[৩]।

ইউরোপের জাতিগত বিভেদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থিতিয়ে গেছে। এখন তারা পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত। পুরো ইউরোপ তো আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকাতলে আবদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর উল্টো রূপ দেখা যাচ্ছে। বৈপরীত্যটা হলো, ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতিগত হানাহানির অবসান ঘটাল আর আমরা জাতিরাষ্ট্র গঠনের পর পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। অথচ জাতিরাষ্ট্র গঠনের আগে ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর যোগাযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন তা নেই। আর নেই বলেই আমরা এখন এক হতে পারি না।

ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ কেমন ছিল, তার বিবরণ সুনীল অমৃতের এই বইয়ের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন শহর বিভিন্ন সভ্যতার মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ১৫১১ সালে পর্তুগিজরা আজকের মালয়েশিয়ার মালাক্কা শহর দখল করে নেয়। সে সময় টম পায়ার্স নামের এক ওষুধ বিক্রেতা মালাক্কা শহরে আসেন। ব্যবসা-

বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রভূত ধন-সম্পদেরও মালিক হন তিনি। *সুমা ওরিয়েন্টাল* নামে এক ভ্রমণকাহিনি লেখেন তিনি। এতে জানা যায়, তখন মালাক্কা শহরের রাস্তায় ও বাজারে ৮৪ ভাষাভাষী মানুষের সন্ধান পাওয়া যেত। যেসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাদের তালিকাও করেছেন তিনি। সুনীল অমৃত তা উদ্ধৃত করেছেন: কায়রোর মুর, মক্কা ও আদেন শহরের মানুষ, অ্যাবিসিনিয়ান, কেনিয়ার মালিন্দির শহরের মানুষ, তুর্কি, গুজরাটি, খ্রিষ্টান আর্মেনীয়, বাঙালি, আরাকান, জাভা, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলত, ১৫ শতক থেকে সমুদ্রবন্দর কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠতে শুরু করে। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমে মালাক্কা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু বন্দর হয়ে ওঠে। ১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে মালাক্কার রাজপরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে ইসলাম, বাণিজ্য ও বন্দর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়।

অন্যদিকে, আজ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্বের কথা সুবিদিত হলেও ১৩ শতকে ভারতের সঙ্গে চীনের পাকাপাকি বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এমনকি চীনের কুয়ানঝু শহরে দক্ষিণ ভারতের বণিক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই শহরে ১৩ শতকে নির্মিত হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদিকে, ভারতের নাগাপাটনাম বন্দরে তিনতলাবিশিষ্ট চীনা প্যাগোডার সন্ধান পাওয়া গেছে, ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তার চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল।

ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ অনেক প্রাচীন। দক্ষিণ এশিয়ার পল্লব রাজবংশের আমলে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য বিকশিত হয়েছে। এই সময় প্রাক্-আধুনিক যুগের বাণিজ্যেও স্বর্ণসময়। এ সময় দক্ষিণ এশিয়ায় চোলা সাম্রাজ্যের যেমন পত্তন হয়েছে, তেমনি পতনও হয়েছে। কাবেরী নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা এই সাম্রাজ্য নবম থেকে ১৩ শতক পর্যন্ত বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায়। এই চোলা সাম্রাজ্যের যুগে ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। এ সময় আয্যভোল ও মনিগ্রামাম নামের শক্তিশালী বাণিজ্য গিল্ড গড়ে ওঠে। জাভার অনেক পুরোনো নথিতে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় বণিকদের উপস্থিতির নজির পাওয়া যায়। ১১ শতকে এই চোলা সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু হয়। সে সময় চোলারা শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপে সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং এর মধ্য দিয়ে নিজেদের নৌশক্তির জানান দেয়। বঙ্গোপসাগরেও উপকূলে গড়ে ওঠা এটিই প্রথম সাম্রাজ্য। এই চোলাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আবার শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য, যারা মালাক্কা প্রণালিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরির চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূমিতে কম্বোডিয়ার আঙ্কর সাম্রাজ্য দক্ষিণের দিকে অগ্রসর

হয়। আর বার্মার পেগু সাম্রাজ্য সিলন বা আজকের শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করার পাশাপাশি সড়কপথে চীনের ইউনান প্রদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। এতে বঙ্গোপসাগরের উত্তর অংশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইতিহাসে আপতিক ঘটনারও অনেক গুরুত্ব আছে। ব্যাপারটা হলো, এর আগে চীনের তাং সাম্রাজ্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে তেমন একটা সম্পর্ক রাখতে চাইত না। একধরনের বিদেশিভীতি ছিল তাদের। কিন্তু ৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে চীনে নতুন সং রাজবংশের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি বদলে যায়। এই রাজবংশ অর্গল খুলে দেয়। ফলে দশম শতকে এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার হয়। একপর্যায়ে উপকূলীয় অঞ্চলের সব সাম্রাজ্যই চীনা ব্যবসা-বাণিজ্যের আশীর্বাদ লাভ করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য চীনের সঙ্গে বাণিজ্য একচেটিয়া করে ফেলছে—এই অভিযোগে চোলারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক অভিযান চালায়।

সুনীল এস অমৃত সাম্প্রতিক জলবায়ুজনিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বলছেন, মধ্যযুগের উষ্ণ পর্বে অর্থাৎ নবম থেকে ১৩ শতক পর্যন্ত এই যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সময় এশিয়ার বর্ষাকাল সংহত হয়েছে, বিভিন্ন আন্ত-আঞ্চলিক জলবায়ুর মিলনক্ষেত্র দক্ষিণের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে। জলবায়ুর এই ধরন এখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা সংহত করেছে এবং কৃষিভিত্তিক ঔপনিবেশিকীকরণ সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু এরপর দুটি ঘটনা এই প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করেছে। প্রথমত, ১৪ শতক থেকে আবহাওয়ার ধরন বদলাতে থাকে, মধ্যযুগের উষ্ণ আবহাওয়া শীতল হতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়া ও চীন মধ্য এশিয়ার আধা যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর করতলগত হয়। তাদের এই ক্ষমতা দখল এত দিন ধরে গড়ে ওঠা এখানকার আঞ্চলিক রাজনীতিকে গভীরভাবে ব্যাহত করে। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে আসার পর সেই যোগাযোগ আবার চালু হয়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—এই কথা যেমন সত্য, তেমনি বাণিজ্য শুধু লক্ষ্মীরই সন্ধান দেয় না, মানুষে মানুষে মিলনেরও ক্ষেত্র তৈরি করে। বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতার মিলন ঘটেছে। বস্তুত, ভারত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক আগে থেকে বিশ্বায়িত। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা বঙ্গোপসাগরের বন্দর শহরগুলোয় বসতি স্থাপন করেছেন, সেখানে তাঁরা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য খুলে বসেছেন, তেমনি স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আর তাঁদের ব্যবসার উপকরণ ছিল মসলা, মণি-মাণিক্য, ঘোড়া ও হাতি। এসব জিনিস নিয়ে বহুদূর চলে যেতেন তাঁরা। তাঁরা তো এসব জায়গায় আগন্তুক ছিলেন, কিন্তু অভিন্ন বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করেছিল। আর যেখানে বিশ্বাসেরও ঘাটতি হতো, সেখানে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান তাঁদের

এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। মানুষ প্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ারও কয়েক শতক আগে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে মানুষ সৌদি আরবের হেজাজে গেছে। অথবা জাপান ও চীন থেকে বৌদ্ধদের পথ ধরে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এসেছে। সে সময় দাস ব্যবসাও ছিল। বলা দরকার, বঙ্গোপসাগর সব সময়ই বিপৎসংকুল ছিল। বিশেষ করে মার্চ-এপ্রিল ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকরী ঝড় হতো সাগরে। কিন্তু চলাচল করতে করতে নাবিকেরা এসব ঝড়ঝঞ্ঝা মোকাবিলার কৌশল এবং ঝড় এড়িয়ে জাহাজ চালানোর বিদ্যা রপ্ত করে ফেলেন। দেখা যেত, এসব বন্দরনগরে মানুষ বহু ভাষায় কথা বলতেন : আরবি, মালয়ি, সোয়াহিলি ইত্যাদি। মোদ্দাকথা, তারা জাতিসত্তার সীমানা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

সুনীল এস অমৃত বলছেন, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরের চারপাশে শক্তিশালী একতা গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে সমুদ্র যাঁদের জীবিকার উৎস ছিল, তাঁদের মধ্যে এই বন্ধন ছিল দৃঢ়তর, ভেতরের দিককার কৃষিজীবী মানুষের তুলনায়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে আরব সাগরের যতটা সম্পৃক্ততা ছিল, ভারত মহাসাগরের সঙ্গে ততটা ছিল না।

অভিবাসীরা মূলত শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তাঁরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে হাত লাগিয়ে জমি পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে গাছ লাগানো ও জঙ্গল সাফ করে বিপুল মুনাফার ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন। বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক এই অভিবাসন বৈশ্বিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মালয়েশিয়ার রাবারশিল্পে কাজ করতেন মূলত তামিল শ্রমিকেরা। সেই রাবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অটোমোবাইল শিল্পের রসদ জুগিয়েছে। ফলে মালয় বা আজকের মালয়েশিয়া উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ব্রিটিশদের সবচেয়ে লাভজনক উপনিবেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে, বার্মা হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চাল রপ্তানিকারী দেশ। এর পেছনে যেমন ছিল ভারতীয় পুঁজি, তেমনি সেই পুঁজি ভারতীয় শ্রমিকদেরও মালয়েশিয়ায় টেনে নিয়ে এসেছে। আগেও বলেছি, এসব কারণে ১৮৪০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে প্রায় ২ কোটি ২৮ লাখ মানুষ অভিবাসন করেছে, যদিও এ নিয়ে তেমন আলোচনা নেই।

সবই একরকম চলছিল। কিন্তু ২০ শতকের প্রথম ভাগে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশের অর্গল ভেঙে জাতিরাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে নতুন এক সমীকরণ গড়ে ওঠে। পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে শুরু করে। এতকালের গড়ে ওঠা যোগাযোগ ও আস্থার সম্পর্ক যেন নিমিষেই মিলিয়ে গেল। রাজনৈতিক ও জাতিগত বিবেচনাই তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যেখানে ইউরোপ এক ছাতার তলে আসতে শুরু করে, সেখানে এশিয়া বিচ্ছিন্ন হতে

শুরু করে। এখানে অবশ্য স্নায়ুযুদ্ধেরও প্রভাব আছে। সুনীল এস অমৃত আমাদের জানাচ্ছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমবিরোধী প্রচারণা ও লড়াইয়ের এক শক্তিশালী ক্ষেত্রে পরিণত করে। ফলে এই অঞ্চলকে তার আলাদা করার প্রয়োজন ছিল। পূর্ব এশিয়াকে নিয়ে আলাদাভাবে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তাও সম্ভবত সে কারণে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে গবেষণা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক টাকা ব্যয় করেছে। আর এসব দেশও উন্নয়নের স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গী হতে পিছপা করেনি।

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনকে উদ্ধৃত করেছেন সুনীল এস অমৃত, 'সভ্যতার প্রতিটি সৌধ যেন বর্বরতার সৌধ।' অমৃত বলছেন, পুরোনো উপনিবেশের ময়দান ও সড়কের ধার দিয়ে নতুন সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়েছে। সেই সৌধ নতুন শক্তির জয়গান গেয়েছে, যে শক্তি একাধারে মানুষকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছে, তেমনি আবার বিযুক্তও করেছে। ১৯৩০-এর দশক থেকেই অভিবাসীদের অবস্থা এমন হলো যে তারা না থাকল ঘরের মানুষ, না থাকল ঘাটের মানুষ, ইংরেজিতে যাকে বলে আউট অব প্লেস। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে, যদিও সুনীল অমৃত এই প্রসঙ্গ খুব একটা বিস্তারিত পরিসরে আনেননি। ব্যাপারটা হলো, এই সময় কর্মসংস্থান কমার পাশাপাশি সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কঠোর হয় এবং অন্যদিকে অশ্লীল গণমাধ্যমে (গাটার প্রেস) অভিবাসীবিরোধী প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। এই সময়ে এসে অভিবাসী ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম 'সংখ্যালঘু' হয়ে পড়ে। নতুন রাষ্ট্রের কারিগরদের কাছে তাঁরা সমস্যাজনক হিসেবে আবির্ভূত হন। সুনীল অমৃতের ভাষায়, নাগরিকত্বের বিনিময়ে নতুন রাষ্ট্র এক দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তোলে।

১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় দেশগুলো একের পর এক স্বাধীন হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লেখক উইলিয়াম ডালরিম্পল লেখককে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ২০ শতকে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম এক বিশেষ ঘটনা, এই জোশে সবাই তখন আত্মপরিচয়ের খোপে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলে[৪]। তিনি বলেছিলেন, 'মূলত উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং জাতিসত্তার সঙ্গে ধর্মের সমীকরণের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে অনেক গভীরভাবে এসব বিভাজন ঘটেছে। ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদ ও পরিচিতিবোধের কারণে মানুষ ক্রমে খাঁচার মধ্যে ঢুকে গেছে। ফলে, এ রকম সরলভাবে বলা যাবে না যে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা অনেক জটিল'। এই প্রবণতা অনিবার্যভাবে মানুষে মানুষে বিভেদের দেয়াল তুলে দেয়। এ নিয়ে ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা 'অ্যাগেইনস্ট দ্য আইডেনটিটি পলিটিকস' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে পরিচয়কামী রাজনীতির স্বরূপ

সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। ফুকুইয়ামাকে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে প্রাসঙ্গিকভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। যা হোক, এই প্রবণতার বশবর্তী হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় দেশগুলো এত দিনের সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে যুক্ত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা। আগেও বলেছি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমবিরোধী প্রচারণার অংশ হয়ে ওঠে।

১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান রিলেশনস করফারেন্সে বার্মার প্রতিনিধি বলেই ফেললেন, তাঁরা এখন এই ভয়ে আছেন যে ব্রিটিশ উপনিবেশের অবসানের পর আবার না ভারতীয় ও চীনা উপনিবেশের খপ্পরে পড়তে হয়। তাই দেখা গেল, স্বাধীনতা লাভের পর বার্মা নাগরিক আইন প্রণয়ন করে ভারতীয়, চীনা, রাখাইন জাতিসত্তার মানুষদের তাড়ানোর বন্দোবস্ত করল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী ভিক্ষুরা মিয়ানমারের বিভিন্ন শহরে ভারতীয়দের দোকানের সামনে অবস্থান নিয়ে ক্রেতাদের ঢুকতে বাধা দেন। আইন সংশোধন করে তাঁরা ভারতীয় ও চীনাদের জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করেন। এভাবে তাঁরা ক্রমে উগ্র বর্মি জাতীয়তাবাদের দিকে ধাবিত হন। ১৯৩১-৩২ সালে বৌদ্ধ ভিক্ষু সায়া সানের নেতৃত্বে বার্মার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। ফলে, সিংহভাগ ভারতীয় নিজ দেশে ফিরতে বাধ্য হন।

শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায়ও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। দক্ষিণ ভারত থেকে অভিবাসন করা তামিলদের নিয়ে শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা তৈরি হয়। একইভাবে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয় ও চীনাদের নিয়ে ভূমিপুত্র মালয়িদেরও বিরোধ তৈরি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয়ি নাগরিকেরা মনে করত, তামিল মুসলমানরা সেখানে বিয়েশাদি করে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করলেও তারা খাঁটি মালয়ি নয়। অথচ মালয়েশিয়ার ইতিহাস মানেই হলো অভিবাসনের ইতিহাস। ভারতীয় ও চীনারা সেখানে যাওয়ার আগে মালয়েশিয়া ছিল জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এরাই সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদের সুযোগ তৈরি করেছে। এই প্রক্রিয়ায় সেখানে তামিলদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি হয়। বিদেশি-বিদ্বেষের পেছনে অর্থনৈতিক কারণও আছে। ১৯৩০-এর দশকে মালয়েশিয়ার রাবারশিল্পে যে বিপর্যয়কর মন্দা তৈরি হয়, তাতে সেকানকার তামিল নেতারাই বলেন, ভারত থেকে নতুন অভিবাসী আনা কমানো হোক। নতুন নাগরিকত্ব আইন করা হয় মালয়েশিয়ায়। অভিবাসীদের বলা হলো যে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করতে হবে। এরপর ১৯৬৯ সালের মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচনে চীনারা ভালো করলে মালয়িরা খেপে যায়। শুরু হয় চীনাবিরোধী দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় প্রায় ২০০ মানুষ প্রাণ হারায় এবং বাস্তুচ্যুত ও আহত হয় আরও বেশি মানুষ। মূলত মালয়ি

শ্রমিকদের ক্ষোভ থেকে এই দাঙ্গার সূত্রপাত। তাঁরা মনে করছিলেন, স্বাধীনতার ফল তাঁরা পুরোপুরি পাচ্ছেন না। ক্ষমতাসীন ইউএমএনও পার্টির তরুণ ও উচ্চাভিলাষী নেতৃত্ব এই শ্রমিকদের উসকে দেয়। এরপর সেখানে ভূমিপুত্র মালয়িদের অনুকূলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়—ভূমি পুনর্বণ্টনও এর মধ্যে অন্যতম। তখন মালয়েশিয়ার শাসনভার ছিল ন্যাশনাল অপারেশনস কাউন্সিলের হাতে। কাউন্সিল তখন এক জরুরি ডিক্রি জারি করে, অনাগরিকদের কাজ পেতে হলে বিশেষ অনুমোদন নিতে হবে, আবার সেই কাজ করার মতো স্থানীয় মানুষ পাওয়া না গেলেই কেবল অনাগরিকেরা সেই কাজ পাবে। মূলত, ভারতীয়দের লক্ষ্য করে এই বিধান করা হয়। মালয়েশিয়ার ভারতীয়দের অবস্থা অনেকটা শ্রীলঙ্কার ভারতীয়দের মতোই হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো বিশ্বায়নবিরোধী নেতার নির্বাচিত হওয়া এবং যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া উন্নত দেশগুলোর বিশ্বায়নবিরোধী হওয়ার লক্ষণ। অভিবাসীদের কারণে এসব দেশের স্থানীয় মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছে—এটা যেমন ঠিক, তেমনি বিশ্বায়নের কারণে কল-কারখানা বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। মজার ব্যাপার হলো, আজ ইউরোপে বাম ও ডানপন্থীরা উভয়েই পরিচয়কামী রাজনীতির খপ্পরে পড়েছে। বামপন্থীরা একদিকে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের দাবি তুলছেন, বৃহত্তর শ্রেণি ঐক্য এখন আর তাদের রাজনীতির দাবি নয়; অন্যদিকে ডানপন্থীরা মানুষকে বলছে, 'আমরা সবাই এক বৃহৎ ও মহৎ জাতির অংশ ছিলাম, কিন্তু অভিবাসী, বিদেশি ও অভিজতরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে[৫]।' এই জাত্যভিমানী স্লোগানে জাতি ও ধর্ম একইভাবে আবেদন সৃষ্টি করে। ভারতে বিজেপি ও আরএসএস বলছে, হিন্দুরা এক মহান জাতি, মুসলমানরা বা বিদেশিরা এই জাতিকে দূষিত করেছে। রাজনীতির এই ধারা মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটাচ্ছে। এক পক্ষকে আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। তবে পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রধান দুই দেশের মানুষের মধ্যে বিশ্বায়নবিরোধিতা অস্বাভাবিক নয়, কারণ তারা এর জন্য ভুক্তভোগী হয়েছে। কিন্তু এশিয়ার বিচ্ছিন্নতা বেশ পুরোনো এবং তা মূলত জাতিকেন্দ্রিকতা থেকে সৃষ্ট বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়। আগেও বলেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমবিরোধী প্রচারণায় এই দেশগুলোর যুক্ত হওয়াও এই বিচ্ছিন্নতার পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। অঞ্চলভিত্তিক পাঠের হিড়িক পড়ে যায় সে সময়।

সুনীল অমৃত জানাচ্ছেন, মার্কিন সরকার তখন বার্কলে, কর্নেল ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক পাঠের জন্য প্রচুর তহবিল দিয়েছে। টাকা পেয়ে বা জ্ঞানতাত্ত্বিক জোয়ারে ভেসে গবেষকেরাও তখন বিচ্ছিন্নভাবে দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার ইতিহাস পাঠ করেছেন। আর এমনভাবেই করেছেন যে তাকে বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছেড়েছেন। ভাবখানা এমন, ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগ কোনোকালেই ছিল না।

রাজনীতিতে আজ জনতুষ্টিবাদের জোয়ার। নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনীতি দেশে দেশে বৈষম্য প্রকট করে তুলেছে। সেই বৈষম্যজনিত অসন্তোষে প্রগতিশীল ও উদারনীতিক রাজনীতি আছে, তা আজ অস্বীকার করা ঠিক হবে না। সেই সুযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদি, দুতার্তে ও এরদোয়ানের মতো দানবীয় রাজনীতিকের আবির্ভাব ঘটেছে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্র তো হারিয়ে গেছে, উদার গণতন্ত্রও আজ হুমকির মুখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন এশিয়ার উত্থান হচ্ছে, ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, ২০৪০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জিডিপির ৫০ শতাংশের বেশি আসবে এই মহাদেশ থেকে। বৈশ্বিক ভোগের ৪০ শতাংশও হবে এই অঞ্চলে। শুধু অর্থনৈতিক সূচকেই নয়, মানুষের আয়ু বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এশিয়া বেশ এগিয়ে গেছে[৬]। বিশ্বের শীর্ষ ছয়টি জিপিডির তিনটিই এখন এশিয়ায়—জাপান, চীন, ভারত। আগামী দিনে বৈশ্বিক রাজনীতির রাশও তাই স্বাভাবিকভাবে এশিয়ার হাতে চলে আসবে। পরাগ খান্নার মতো রাজনীতিবিশারদেরা এখন এই ব্যাপারকে সভ্যতার এশীয়করণ হিসেবে অভিহিত করছেন[৭]। ফলে, এই পরিস্থিতিতে এশিয়ার দেশগুলোর এ রকম জাত্যভিমানী হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। নেতৃত্ব দিতে গেলে তাদের কিছুটা উদারতার প্রমাণ দিতে হবে।

উদারতার ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলো নরডিক দেশগুলোর দৃষ্টান্ত আমলে নিতে পারে। এই দেশগুলো গভীরভাবে গণতান্ত্রিক। তারা জানত যে অধিকাংশ শ্রমিক যদি বিশ্বায়নকে উপকারী মনে না করেন, তাহলে সেটা টেকসই হবে না। আর এসব দেশের ধনীরা বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বায়নের যেভাবে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে হলে ব্যাপক সুবিধা পাওয়া সম্ভব ছিল[৮]। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের যোগ ঘটাতে হবে। কাউকে বিচ্ছিন্ন করে বা পেছনে ফেলে রেখে যে সেটা সম্ভব নয়, আশা করি, সে কথা এখন আর দ্বিতীয়বার বলার অবকাশ নেই। আসিয়ানের সঙ্গে সার্ক বা বিমসটেকের যোগ ঘটাতে হবে। চীনের সঙ্গে ভারত ও অন্যান্য দেশের অবাধ বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বলাই বাহুল্য, এশিয়ার সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। সে নিজের মতো করেই সমস্যার সমাধান করবে, তা ঠিক, কিন্তু উদারতার বিকল্প নেই—বিষয়টি বিস্মৃত হওয়া যাবে না।

অন্যদিকে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে এবং তাদের ওপর নিপীড়ন বন্ধে সমগ্র এশিয়াকেই এক জায়গায় আসতে হবে। তা না হলে সামনে ঘোর

বিপদ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, দুয়ার বন্ধ করে রাখা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. *অন ন্যাশনালিজম*, ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।

২. https ://www.prothomalo.com/opinion/article/1323791/%e0%a6%86%e%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf?fbclid=IwAR0aTSyg4AkKSZe0ah8v5Rc_lw9ideYiSH0zbOEoSEePmkrw1PvI80PyRX4

৩. *অন ন্যাশনালিজম*, ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।

৪. https ://www.prothomalo.com/onnoalo/article/1382311/%E2%80%98%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0% A6%B2%E2%80%99

৫. Francis Fukuyama, "Against Identity Politics : The New Tribalism and the Crisis of Democracy", *Foreign Affairs*, September/October, 2018. Can be accessed at : https ://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2018-08-14/against-identity-politics-tribalism-francis-fukuyama

৬. Oliver Tonby et. al., "Asia's Future is Now", Discussion Paper, McKinsey & Company, July 2019. Can be Accessed at : https ://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now

৭. প্রাগুক্ত

৮. https ://www.prothomalo.com/economy/article/1607991/%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E%A7%8E-%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87

লে খ ক প রি চি তি

মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক। একই বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে। বিষয় ছিল রাজনৈতিক প্রতিবেশ। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য জার্নালে প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্প্রতি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন : *নিউ লিবারেল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ*, (ইউপিএল ২০১৯)। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রতিবেশ এবং উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা তাঁর শিক্ষকতা ও গবেষণার বিষয়।

সায়মা আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডি গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লেচার স্কুল অব ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি থেকে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। পড়াশোনার বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন। মানবাধিকার, নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর বেশ কিছু প্রবন্ধ, বইয়ের অধ্যায় এবং মনোগ্রাফ লিখেছেন। মানবাধিকার, মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, পরিবেশগত নিরাপত্তা ইত্যাদি তাঁর গবেষণার আগ্রহের বিষয়।

আলতাফ পারভেজ

স্বাধীন গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। পড়েছেন দর্শনশাস্ত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে আগ্রহী দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত *রাষ্ট্রচিন্তা*, *প্রতিচিন্তা*, *নতুন দিগন্ত*, *সংস্কৃতি*, *সর্বজনকথা* ইত্যাদি জার্নালে লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১৫। সর্বশেষ প্রকাশিত হয়েছে *যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ* (প্রথমা), *শ্রী লঙ্কার তামিল ইলম্ ও দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি-রাষ্ট্রের সংকট* (ঐতিহ্য), *বার্মা : জাতিগত সংঘাতের সাত দশক* (ঐতিহ্য)।

শ্রুতি এস পাটানায়েক

বর্তমানে দিল্লির ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস (আইডিএসএ) নামক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ফেলো হিসেবে কর্মরত। দক্ষিণ

এশিয়া বিষয়ের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক তাঁর গবেষণার বিষয়। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা-আগ্রহ হলো সীমান্তবর্তী দেশগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতের প্রতিবেশীর প্রতি নীতি খতিয়ে দেখা। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জার্নালে ৫০টির বেশি নিবন্ধ লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্পাদিত বইয়ে ৫০টির বেশি অধ্যায় লিখেছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়া এবং এ অঞ্চলের প্রতি ভারতের নীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: *Elite Perception in Foreign Policy: Role of Print Media in influencing Indo-Pak relations, 1989-99* (RCSS and Manohar, 2004)। সম্পাদনা করেছেন দুটি বই: *South Asia: Envisioning a Regional Future* (2011), *India-Bangladesh relations: Historical Imperative and Future Direction* (2012)।

আলেকজান্ডার লিবম্যান ও আনাসতেসিয়া ভি অবিডেঙ্কোভা

আলেকজান্ডার লিবম্যান বর্তমানে লুডভিগ ম্যাক্সিমিলিয়ান ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখের ইস্ট ইউরোপিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক। আনাসতেসিয়া ভি অবিডেঙ্কোভা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত 'খণ্ডিত পৃথিবীতে আঞ্চলিকতাবাদ এবং আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সংগঠন' নামক গবেষণা প্রকল্পের সহপরিচালক। এ ছাড়া মস্কোয় অবস্থিত ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হাইয়ার স্কুল অব ইকোনমিকসের নেতৃস্থানীয় গবেষণা ফেলো। এর বাইরেও তিনি ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক অ্যানালাইসিস অব দ্য স্প্যানিশ কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত।

খলিলউল্লাহ্

লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে (বিসিএএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে *প্রতিচিন্তার* সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনৈতিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভূরাজনীতি, সামাজিক উন্নয়নসহ সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করেন।

প্রতীক বর্ধন

সাংবাদিক ও অনুবাদক। বর্তমানে দৈনিক *প্রথম আলোর* সহসম্পাদক পদে নিয়োজিত। অনুবাদের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত কলামও লিখে থাকেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শ) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬